
ঠাকুরমার ঝুলি

ঠাকুরমার ঝুলি

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



বসাক বুক ষ্টোর

ঠাকুরমার ঝুলি

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



বসাক বুক স্টোর

উপহার

প্রকাশক : শ্রীবিশ্বনাথ বসাক
বসাক বুক ষ্টোর
৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ পট : শৈলেশ পাল

মুদ্রক : দি সারদা প্রিন্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-১২

দাম—ছয় টাকা



এক রাজামশাই ! তাঁর নাম ছিল ভৈরব ।

রাজা ভৈরবের রূপ ছিল রূপোর মত, গুণ ছিল আগুনের মত, সাহস ছিল, বল ছিল, বুদ্ধি ছিল । আরও কত কি-ই না ছিল !

সেই রাজার আর ছিল কি ?—আর ছিলেন চারটি রাণী । তাঁদের আদরের নাম ছিল ঃ মৌরাণী, ফুলরাণী, সোনারাণী আর রূপরাণী ।

রূপার মত ছিল তাঁদের হাত, চাঁদের মত ছিল তাঁদের চাউনি । তাঁদের মুখের মিষ্টি কথায় দূর করে দিত অনেকের মনের দুঃখ ও ব্যাথা !

রাজা ভৈরব আর সেই যে চার রাণী, তাঁদের ছেলে ও মেয়ে ছিল কয়টি—একটিও না। তাই রাজা আর রাণীদের মনে বড়ই দুঃখ !

তাঁরা সর্বদাই মনে মনে বলেন, ভগবান ! আমাদের একটি ছেলে দাও, একটি মেয়ে দাও, আমাদের বুক জুড়িয়ে দাও !

ঐভাবে দিন যায় রাত যায়। দিনের পর দিন যেতে যেতে, এসে গেল একটি দিন। হঠাৎ রাজবাড়িতে এলেন একটি সাধু। তাঁর মাথায় জটা, কপালে ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল আর চিমটা। তাঁর দাড়ি যেন বনের বড় লম্বা ঘাসের মত।

সেই সাধুকে দেখা মাত্র রাজবাড়ির কয়েকটা সিংহ গর্জন করে উঠল, রাজবাড়ির তোরণের চারটি ঘণ্টা আপনি বেজে উঠল, শত শত শাঁখ বাজল।

সাধুমশাই রাজার ও রাণীদের প্রণাম পেলেন। দুধ-ঘি-ফল-মূল বেশ খেলেন। তারপর বললেন, রাজা বাবাজী আর রাণীমায়েরা, তোমাদের মনের দুঃখ দূর হবে। আনন্দে মন হবে ভরপুর।—তোমাদের একটি ছেলে হবে।

রাজা ও রাণীরা বলে উঠলেন, "কবে হবে ? কবে ?"

ঠিক সেই সময়ে তাঁরা দেখলেন, সাধু যেন কি সব বলতে বলতে, টলতে টলতে, শূন্যে উঠতে লাগলেন, তারপর নিজের শরীর থেকে আলো ফুটিয়ে ও ছুটিয়ে, একটি ঢেঁকিতে চড়ে উপর দিকে ছুটতে লাগলেন। তাঁর শরীর থেকে তখন আলোর কণা ছুটতে লাগল, আর সেইগুলো ফুল হয়ে শূন্যে ফুটতে লাগল।

সেই দিন থেকে রাণীদের ও রাজার মনে মনে বাজতে লাগল আনন্দের ঝংকার।—ছেলে পাব, ছেলে পাব বলে !

রাজা ভৈরব, তিনি ছিলেন খুব ভাল একজন শিকারী। বনের বাঘ, ভালুক, গণ্ডার আর অন্য সব জানোয়ার তিনি ভাল শিকার করতে পারতেন।

একদিন চললেন তিনি পশু শিকার করতে। সঙ্গে নিলেন কত রকম হাতিয়ার ! শিঙ্গা, ভেরী, তূরী বাজতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে চার রাণী ছুটে এলেন রাজার কাছে। বললেন মিনতি করে, "মহারাজ ! আপনি পশু শিকারে যাবেন না আজ !" রাজা বললেন, "কেন ? কেন যাব না ?"

চার রাণী খুব উদ্বিগ্নভাবে বললেন, "আমরা স্বপ্ন দেখেছি, আজ শিকারে গেলে, আপনার ও আমাদের মঙ্গল হবে না, হবে অমঙ্গল।"

রাজা বলে উঠলেন, "পাগল ! পাগল ! তোমরা কি পাগল হয়েছ ?—ঘরে বসে থাকলেও কি

মানুষের অমঙ্গল হয় না?—হতে পারে না?—আমি বিপদকে করি না ভয়। আমি বিপদকে করব জয়! তোমরা তোমাদের মনের অশান্তির ভাবকে দূরে ভাগিয়ে দাও।"

রাজা শিকারে চলে গেলেন।

তারপর শিকারী রাজা এক ঘোর জঙ্গলে ঢুকলেন। সারাদিন ধরে পশু শিকারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাঘ, ভালুক, শূয়োর, গণ্ডার, হাতি, হায়না প্রভৃতির কোনটাকেই শিকার করতে পারলেন না।

দিন কোথায় চলে গেল। রাত এসে তার জায়গা দখল করল। সেই সময়ে, আলো-আঁধারের মধ্যে রাজা ভৈরব দেখলেন, একটি হরিণ হনহন করে তার সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে যেন নাচছে।

রাজা তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু তীরটা তেড়ে গিয়েও হরিণটাকে হত্যা করতে পারল না। সে পালালো।

তখন রাতের বেলা। আকাশে উল্কার খেলা! আবার দৈত্য-দানবের মেলা! রাজার তখন একটা আশ্রয় চাই। রাজা দিশেহারা হয়ে চলতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন, কাছেই একটা কুটির। রাজা কুটিরের দুয়ারে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন এক বুড়ী—তার বয়েস হবে ছ'কুড়ি, বছর। বুড়ি বলে উঠল, তুমি আশ্রয় চাও?"

রাজা বললেন, "যদি তুমি দয়া করে আশ্রয় দাও।"

বুড়ী তখন টুংটাং করে একটা ঘণ্টা বাজাল। রাজার মনটা যেন কেমন করে উঠল।

তখনই রাজার সামনে এসে দেখা দিল একটি মেয়ে। তাকে দেখেই রাজার মনে হল, এই একটু আগে আমি একটি হরিণকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিলুম, সেইটিই তো বোধহয় এই!—কী ব্যাপার!

সেই মেয়েটি বলে উঠল, "রাজামশাই, আপনার ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনার রানী আছে চারটি। কিন্তু আপনি চান আরও একটি!—রাজা কোন কথা বললেন না।

মেয়েটি বলতে লাগল—আপনি যদি আপনার চারটি রাণীর আটটি চোখ আমাকে উপহার দিতে পারেন, তাহলে আমাকে আপনার রাণী করতে পারেন। আপনি তা করতে রাজী আছেন? রাজা ভূতে-পাওয়ার মত ভাবে বলে উঠলেন, "আছি।"

তারপর আর বেশী কিছু কথা নয়। পরদিন রাজা সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন রাজবাড়িতে।

সেই মেয়েটির নাম—সোনামায়া। রাজা সোনামায়ার কথামত চারটি রাণীর আটটি চোখ

তুলে নিলেন। দিলেন তা সোনামায়ার হাতে। তারপর চার রাণীকে রেখে দিলেন একটা মাটির তৈরী ঘরে। রাজা তাঁর নিজের জীবনটিকে মাটি করে দিলেন। তিনি সোনামায়াকে করলেন তাঁর রাণী।

এখন, রাজার নতুন রাণী সোনামায়া নিত্য নতুন বায়না ধরেন। রাজা বাধ্য হয়ে তা পূর্ণ করেন। ওদিকে চারটি অন্ধ রাণী অন্ধকারে কাল কাটান।

রাণী সোনামায়া আজ চায়, জল দিয়ে তৈরী জিলিপি, কাল চায়, আলো দিয়ে তৈরি আলোয়ান আর হাওয়া দিয়ে তৈরী হালুয়া। কখনো চায় লোহা দিয়ে তৈরী লেবেনচুস কখনো চায় হাঁচি দিয়ে তৈরি সোনার হার। রাজা সেই রাণীর আবদার পূরণ করেন। কয়েক বছর ঐ ভাবে চলে যায়।

এদিকে সেই অন্ধ রাণী চারটির তখন কি অবস্থা?—বড়ই দুরবস্থা!—খাওয়া নেই, পরা নেই, চোখে নেই ঘুম।

কিন্তু সেই দুঃখের মধ্যেও তাঁরা একটু সুখের মুখ দেখছেন। ঐ চার রাণীর একজনের একটি ছেলে হয়েছে কয়েক বছর আগে।

ছেলেটি দেখতে কি রকম?—লাখ লাখ চাঁদ, লাখ লাখ তারা আর লাখ লাখ ফুল একসাথে থাকলে, দেখলে হয় যেই রকম, সেই ছেলেটি ঠিক সেই রকম! রাণীরা তার নাম রেখেছেন—চক্‌চক্‌চাঁদ।

কুমার চক্‌চক্‌চাঁদ তার অন্ধ ও বন্দিনী মায়েদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। সে সেই মাটির ঘর থেকে গোপনে বাইরে চলে যায়। মায়েদের জন্য ফলমূল পাঁচ রকম, পাঁচ রকম মেঠাই-মণ্ডা কোথা থেকে নিয়ে আসে। চক্‌চক্‌চাঁদের সৎমায়েরাও তাকে আপন মায়ের মতই ভালবাসে।

এই সময়ের মধ্যেই কিশোর বয়সী চক্‌চক্‌চাঁদ খুব একজন চোখা ও পাকা শিকারী হয়ে উঠেছে। সে বনে গিয়ে খুব সহজেই বাঘ মারে, ভালুক মারে।

সে সেই নগরের নানা লোকের সাথে মেশে। তার কথায় ও কাজে সকলের মনই খুশী হয়। আর সে সকলের প্রিয় হয়।

একদিন রাজা ভৈরবের জাদুকরী রাণী সোনামায়া রাজবাড়ির ছাদের উপর বেড়াচ্ছে। আর তার পোষা কয়েকটা পায়রা তার চারধারে উড়ছে। হঠাৎ একটা তীর কোথা থেকে তেড়ে এল, একটা পায়রার গায়ে বিঁধল। সোনামায়া তখনই দেখল, একটি কিশোর ছেলে ঐ কাজটা করেছে।

জাদুকরি সোনামায়া তার মায়া-বিদ্যার বলে তখনই বুঝল,—সেই ছেলে অন্ধ-করা, বন্দী-করা চার রাণীর এক রাণীর ছেলে। সোনামায়ার মনে তখন রাগের আগুন জ্বলল। কিন্তু সে বাইরে রাগের ভাব না দেখিয়ে আদরের স্বরে চক্‌চক্‌চাঁদকে বলল, "খোকা, তুমি তো খুব চোখা ও পাকা। তোমার ঐ তীরে-বাঁধা পায়রাটা আমাকে দেবে ?— আমি তোমাকে অনেক টাকা দেব—অনেক !" চক্‌চক্‌চাঁদ বলে উঠল, "না দেব না।" আমার অন্ধ-করা বন্দিনী মায়েরা এটা রান্না করে খাবেন। তাই আমি মেরেছি !"

জাদুকরী সোনামায়া তখন রেগে আগুন ! সে তখন চক্‌চক্‌চাঁদকে করতে চায় খুন। কিন্তু সে ভারি দরদের সুরে বলল, "ওগো খোকা, তুমি যদি তোমার মায়েদের আটটা চোখ ফিরে পেতে চাও, তাহলে পায়রাটা আমাকে দাও। সেই চোখগুলো তুমি যাতে সহজেই পাও, তার ব্যবস্থা অমি করবই করব !"

চক্‌চক্‌চাঁদের মন ছিল সরল। সে সেই জাদুকরীর কথায় ভুলে গেল, পায়রাটা দিয়ে দিল। সোনামায়া তখনই তার জাদুকরী মায়ের কাছে জাদুর ভাষায় একটা চিঠিতে লিখল ঃ এই পত্রবাহক তোমার কাছে যখনই যাবে, তখনই তুমি তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাবে !

কিন্তু সরলমনা চক্‌চক্‌চাঁদের হাতে সে সেই চিঠিটা দিয়ে বলল, "তুমি এখনই এই চিঠি নিয়ে মায়ামণ্ডিনগরে আমার মায়ের কাছে যাও। তার কাছ থেকেই তোমার মায়েদের সবকয়টা চোখ তুমি ফিরে পাবে।"

সরলমনা চক্‌চক্‌চাঁদ সেই চিঠির ভাষা কিছুই বুঝল না। সে তখনই চিঠি নিয়ে চলল সোনামায়ার জাদুকরী মায়ের আস্তানার দিকে।

কয়েকদিন চলল সে। আরও চলল। তখন হঠাৎ এক পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে এসে চক্‌চক্‌চাঁদকে পিঠে তুলে নিয়ে, আবার চলল উড়ে, অনেক দূরে।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হল কি—ভাল লোকের ভাল করেন যে ধর্মদেবতা, তিনি চক্‌চক্‌চাঁদের জামার পকেটের ভিতর থেকে সোনামায়ার লেখা সেই ভীষণ চিঠিটা নিয়ে নিলেন। সেখানে আর একটা চিঠি রেখে দিলেন। তাতে লিখে দিলেন ঃ মা তুমি এই পত্রবাহক ছেলেটিকে খুব আদর করবে। আটটা চোখ এর হাতে দিয়ে দেবে।

কিন্তু ধর্মদেবতার এমনই প্রভাব যে, চক্‌চক্‌চাঁদ ঐ ব্যাপারটার কিছুই টের পেল না। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়া চক্‌চক্‌চাঁদ কিছুকাল পরেই সোনামায়ার সেই মায়ের আস্তানায় পৌঁছে গেল। গিয়ে দেখল, তার মায়েদের আটটি চোখ একটা সূতোয় গাঁথা

আর সেটা একটা মালার মত হ্য়ে মায়াবিনী বুড়ীর গলায় দুলছে। কুমার চক্‌চক্‌চাঁদ তার চিঠিটা বুড়ীর হাতে দিয়ে দিল। চিঠি পড়ে বুড়ী যেন ঝুড়ি ঝুড়ি আনন্দ পেল। সে চক্‌চক্‌চাঁদকে চারশো রকম খাবার খাওয়াল। চোখ আটটি দিয়ে দিল। তার তখন কতই আনন্দ! ঘোড়ায় চড়ে চলল উড়ে।

এদিকে জাদুকরি সোনামায়া তার মায়াবিদ্যার জোরে ঐ সব ব্যপারগুলো জানতে পারল। সে তখন একটা হুংকার করল। ছুটল আকাশ-পথ দিয়ে! তার নাক, চোখ মুখ থেকে তখন বেরুচ্ছে আগুন আর ধোঁয়া! সেই আগুন আর ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরুল কয়েকটা দানব। তারা হুংকার করতে করতে চলল ছুটে চক্‌চক্‌চাঁদকে বধ করবার জন্য!

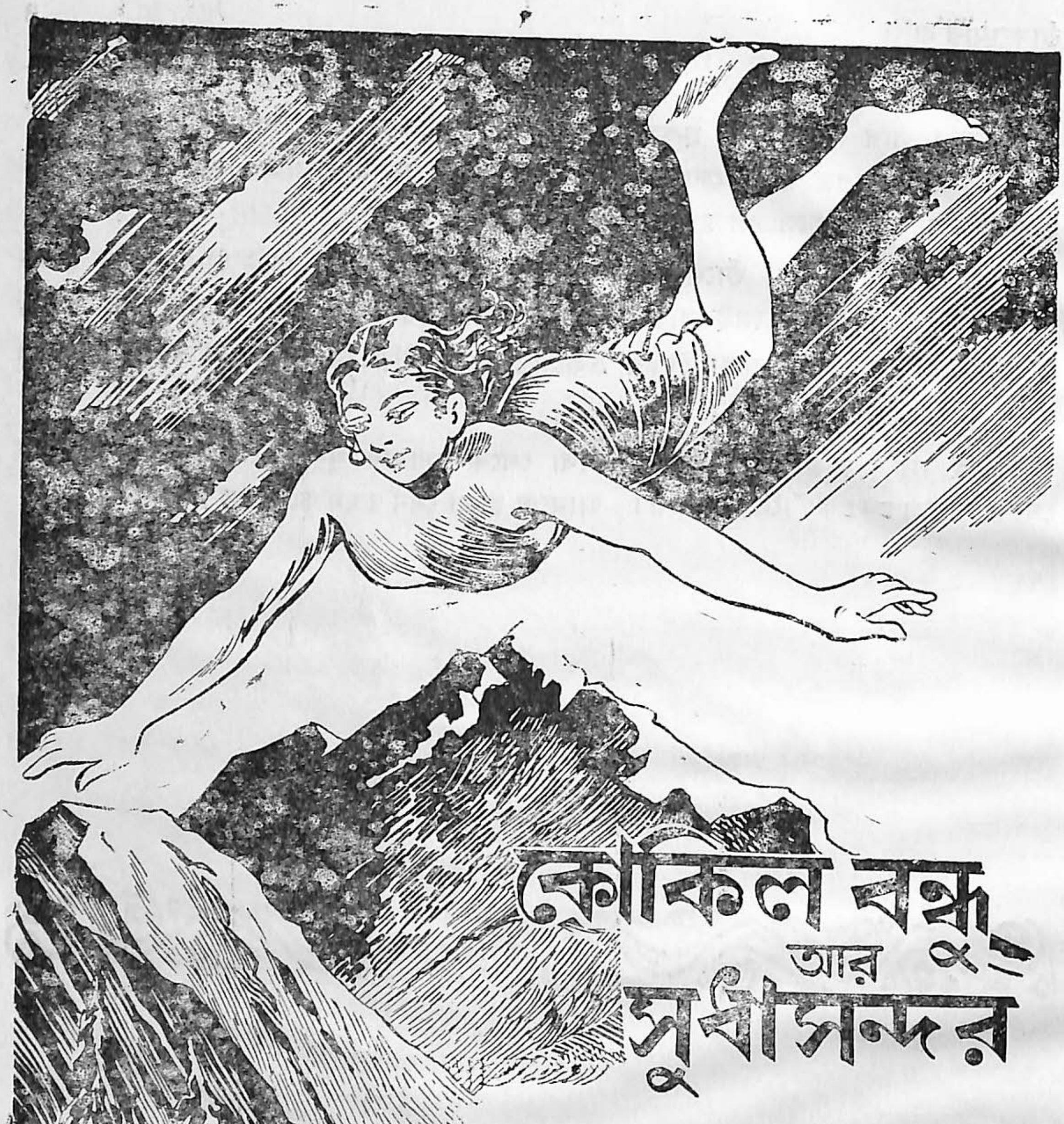
তারপর কিশোর বীর চক্‌চক্‌চাঁদ আর সেই দানব কয়টার মধ্যে লেগে গেল লড়াই। জাদুকরী সোনামায়াও এসে ভিড়ল তার দানব কয়টার দলে। চক্‌চক্‌চাঁদ এখন তীরের পর তীর



ছুঁড়ছে। আর দানবেরা ছুঁড়ে মারছে বড় বড় গাছ, বড় বড় পাথর, মুষল! সোনামায়া গর্জন করে তার দানবদের হুকুম করল, "ঐ চকচকচাঁদকে বধ কর!—বধ কর!" তখন কুমার তীরের দ্বারা সোনামায়া ও দানবদের বধ করে ফেলল, কুমারের হ'ল জয়। তারপর চকচকচাঁদ চলে এল তার মায়েদের কাছে।

অন্ধকরা বন্দিনী রাণীরা তাঁদের চোখ ফিরে পেলেন। তাঁরা সেই আঁধার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন সেই রাজবাড়িতে আপনা-আপনি বেজে উঠল শত শত শাঁখ, হাজার হাজার ঢাক। রাজা ভৈরব চকচকচাঁদকে তাঁর নিজের ছেলে বলে জানলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শুধু তাই নয় রাজা তাঁর নিজের মাথা থেকে সোনার মুকুট তুলে পরিয়ে দিলেন তাঁর সোনার ছেলে চকচকচাঁদের মাথায়। আনন্দে রাজ্য যেন তখন ডুবে যায়!



কোকিল বন্ধু আর সুধাসন্দর

জয়রাজনগরে, এক রাজার ঘরে, ছিল তাঁর একটি মাত্র ছেলে। তার নাম সুধাসুন্দর! ছেলেটি রূপবান, বুদ্ধিমান, গুনবান। সে বড় হয়ে উঠল। তার চোহারা সুন্দর ফুটল।

রাজকুমার সুধাসুন্দর একদিন তার বাবাকে বলল, "পিতা, আমি নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে চাই। নানা কথা জানতে চাই, শুনতে চাই। নানা বিষয় শিখতে চাই।"

রাজকুমারের পিতা জয়কেতন বাহাদুর তাঁর ছেলের শিক্ষার আগ্রহ দেখে বেশ খুশী হলেন। তিনি ছেলেকে নানা দেশ ভ্রমণের অনুমতি দিলেন।

রাজকুমার সুধাসুন্দর চলে গেল দেশ ভ্রমণে ভারী আনন্দিত মনে। কয়েকদিন চলার পর একদিন সন্ধ্যায় সে দেখতে পেল একখানি কুঁড়েঘর। সেখানে এক বুড়ো ছুতোর কাঠ দিয়ে নানা রকম জিনিষ বানায়।

রাজকুমার সুধাসুন্দর সেখানে সেই রাতের জন্য আশ্রয় চাইল। বুড়ো আর বুড়ী স্ত্রী সুধাসুন্দরকে আশ্রয় দিল। রাতে ঘুমোবার আগে সুধাসুন্দর সেই বুড়ো ও বুড়ীকে বলল, "আপনারা আমাকে এই কাঠের কাজ শিখবার সুযোগ দিন না!"

বুড়ো ও বুড়ী তখনই সুধাসুন্দরের কথায় রাজী হয়ে গেল। কারণ তাদের ঘরে তাদের বলতে আর কেউ ছিল না।

তারপর, অল্পদিনের মধ্যেই রাজকুমার হয়ে গেল চমৎকার এক ছুতোর। একদিন সে তৈরী করে ফেলল একটি কাঠের কোকিল। সেটি হল এমনই চমৎকার, যেন সত্যি জীবন্ত একটি পাখী। পরের দিন বাজারে সেই কাঠের কোকিল বিক্রি হল এক টাকায় নয়, ছয় টাকায় নয়, একেবারে নয় টাকায়! তারপর রোজই খরিদ্দার আসতে লাগল সেই কুঁড়েঘরের দরজায়।—সকলেই কোকিল চায়!

রাজকুমার সুধাসুন্দর তখন রাত-দিনই শুধু কাঠের কোকিলই বানায়, আর বানায়!—আর অল্পকালের মধ্যেই সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। কী মজা!

একদিন রাতে সুধাসুন্দর ঘুমিয়ে আছে। তখন সে স্বপ্নে দেখল, কোন এক অচিনদেশে, অচিনপুরে রয়েছে এক রাজকন্যা। রয়েছে সে সোনার ঘরে। কিন্তু সেই ঘরের চারধারে উঁচু উঁচু পাহাড় আর পাহাড়—এন্তার পাহাড়।

সেই রাজার মেয়ে রাজকন্যা পণ করেছে,—যে তরুণ লাফ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে সেই পাহাড়, তার সাথেই বিয়ে হবে তার!

সুধাসুন্দরের সুন্দর স্বপ্নটি ভেঙে গেল। সে তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। ভাবল,—কোথায় সেই দেশ, আর কোথায় সেই রাজকন্যা? কেমন করে সেখানে যাওয়া যায়।

সুধাসুন্দরের হাতের কাছেই তখন ছিল তার তৈরী একটি কোকিল। সেই কোকিল মানুষের মত কথা ব'লে উঠল,—রাজকুমার কোন চিন্তা নেই তোমার! তুমি এখনই আমাকে সাথে

নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়। সামনে যে পথ পাও, সেই পথ ধর!"

"তাই হোক! তাই হোক!" বলে, রাজকুমার সুধাসুন্দর তার কথা-বলা কোকিলের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিক তখন অন্ধকারে ঢাকা। মাঝে মাঝে উল্কা আকাশে লাফ দিচ্ছে। আর সুধাসুন্দর ভাবছে তার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার কথা।

রাত যখন প্রায় ভোর হয়ে এল, তখন সেই কোকিলের মায়ার বলে তারা উপস্থিত হল সেই রাজকন্যার দেশে। সেই সোনার ঘর আর সেই রাজকন্যা তখন আর দুরে নয়।

সুধাসুন্দর আর তার কোকিল বন্ধু পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দিনটা কাটিয়ে দিল। তারপর এল রাত।

এইবার সুধাসুন্দর লাফ দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কতবারই না সেই চেষ্টা সে করল। কিন্তু হায়, পাহাড় কি লাফ দিয়ে অতিক্রম করা যায়!—কুমার তখন ক্লান্ত, অবসন্ন, দুর্বল!

কোকিল বন্ধু বলে উঠল, "আমি প্রকাণ্ড এক খণ্ড পাথর দিয়ে তোমার মাথায় আঘাত করব। তার ফলে তুমি মরেও যেত পার। কিন্তু মরে যদি না যাও, তা হলে সেই আঘাত পাওয়ার পরেই তুমি হবে এমন শক্তিশালী যে, এক লাফেই পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারবে।—এখন লাগাব তোমার মাথায় পাথরের আঘাত।—ভয় পাচ্ছ না তো?"

রাজকুমার সুধাসুন্দর বীর পুরুষের মত বলে উঠল, "ভয় ভাঙুক! আমার তেজ-বল জাগুক!" তখন তখনই রাজকুমারের কোকিল বন্ধু মস্তবড় একখণ্ড পাথর তুলল, আঘাত করল রাজপুত্রের মাথায়।—আর কোথা যায়!—রাজপুত্রের শরীরে যেন এল একলাখ হাতীর বল! সে লাফ দিল। সেই উঁচু—অতি উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে রাজকুমারীর সোনার ঘরের সামনে। সে হয়ে গেল অজ্ঞান। পুবদিকে তখন দেখা দিল আলোর রাজা সূর্য শ্রীমান।

একটু পরেই হয়ে গেল ভোর। রাজকুমারী খুলল তার সোনার ঘরের দোর। তখন সে দেখে যে, কে একজন পড়ে রয়েছে দোরের গোড়ায়। দেখতে সে বেশ সুন্দর! কিন্তু তার প্রাণ হয়তো দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

রাজকুমারী তার ফুলের মত কোমল হাত দিয়ে রাজকুমার সুধাসুন্দরের শরীর করল স্পর্শ, কি জানি কি কারণে রাজকন্যার মনে জাগল অফুরন্ত হর্ষ! ঠিক সেই সময়ে রাজকুমারীর পিতামাতা রাজাবাহাদুর ও রানীমা ভোরের ভ্রমণ করতে সেইখানে এসে পড়লেন। তাঁরা তাঁদের অচেনা যুবকটির গায়ে হাত দিয়ে বুঝলেন, প্রাণ চলে যায় নি।

তখনই রাজার আদেশ পেয়ে সেখানে চলে এলেন রাজবৈদ্য এবং আরও কত কি। চলল সেবা! কুমার সুধাসুন্দর সুস্থ হয়ে উঠল। তার মুখে একটু হাসি ফুটল।

রাজকুমারীর পিতা ও মাতা তখন জানতে পারলেন ও বুঝতে পারলেন সবকিছু। রাজা বলে উঠলেন, "হে অচিন দেশের অচিন রাজপুত্র! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জন্মভূমি। তুমিই হবে আমাদের"।

ওদিকে, সুধাসুন্দরের কোকিল বন্ধু ততক্ষণে চলে গিয়েছে সুধাসুন্দরের পিতামাতার কাছে। বলেছে সব ঘটনা। তারপর সেই রাজা ও রানীকে এক মায়ারথে চাপিয়ে যাত্রা করেছে রাজকুমারীর দেশের দিকে। কোকিল বন্ধু নিজে বসেছে। সেই রথের চূড়ায়। সেই মায়ারথ চলে আর চলে।

প্রথম সেই রথ যে দেশের ভিতর দিয়ে চলল, এক সময়ে সেই দেশে ছিল এক বামন। সে লম্বায় ছিল একটুখানি, কিন্তু চওড়ায় ছিল অনেকখানি, তের মণ বা চোদ্দ মণ! সেই বামনের চোখ দুটো ছিল বেশ বড়; কিন্তু নাকটা ছিল খুবই ছোট।

সেই বামন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত, হাওয়া দিয়ে হালুয়া করে খেত; আর একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে, সেইখানে বিদ্যুতের বিছানায় রাত্রে ঘুমোত।

নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে একবার সেই বামন গিয়ে উপস্থিত হল খুব বড় একটা বনের ধারে। সেই বনের নাম চাঁদের বন।

সেই চাঁদের বনে যে একবার ঢুকত, সে নাকি প্রায় যমের মুখেই ঢুকত!

কারণ সেই বনে বহু বেবুন আর বাঘ তো ছিলই! সেই বনে নাকি এমন সব ব্যাং ছিল, যাদের ঠ্যাং ছিল খুব লম্বা লম্বা এক একটা লোহার থামের মত। আর সেখানে নাকি এক একটা পিঁপড়ে ছিল ছোট-খাট একটা পাহাড়ের মত। আর এক একটা পিঁপড়ের পেটে কমপক্ষে মানুষ নাকি থাকতে পারত একজন করে।

সেই বামনবাবুটি সেই বনের কাছে উপস্থিত হয়ে ভাবল, এখন এই বনটা কি করে পার হই? ঠিক তখনই একটা গাছের ডালে বসা একটা পায়রা বলে উঠল,—"তুমি বন পার হবে তোমার পায়ের জোরে, আর তা না হলে আমার পাখার জোরে।

বামন বলে উঠল, "ওহে পায়রা ভাই, তুমি আমাকে তোমার পাখার জোরে এই বন পার করে দেবে?" পায়রাটা হাসল, আর একটু নাচল।

দেখতে দেখতে সেই পায়রা মাটির উপর নেমে এল। তারপর সে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সেই পায়রা এমন বড় হয়ে উঠল যে সে যেন হল একটা পাহাড়ের মত বড়!

বামনবাবুটি তখন সেই পায়রার পিঠে চড়বার চেষ্টা করল।

ঠিক তখনই শূন্য থেকে তার সামনে নেমে এল কার একখানি হাত। সেই হাতে তখন অনেকগুলো পিঠে। নানান রঙের পিঠে।

সেই হাত সেই বামনের মুখের সামনে যেই পিঠেগুলি ধরল, অমনি পিঠেগুলি এক একটা করে বামনের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখনই সেই পাহাড়ের মত পায়রাটি বামনকে বলল,—"এইবার খেলে তো পিঠে? এখন চেপে বস আমার পিঠে।"

বামনবাবুটি তখনই সেই পায়রার পিঠে চাপল।

পায়রা উড়ল। আর সেই সঙ্গে সে ঠোঁটে করে নিয়ে চলল খুব বড় একটা বাঘ।

পায়রা উড়ে চলল। আকাশে ঘুরে ঘুরে চলল।

তারপর হঠাৎ একটা দৈত্য আকাশে দাঁড়িয়ে সেই পায়রার পিঠে চড়া সেই বামনকে ধরে ফেলল।

বামন আর্তনাদ ক'রে উঠল। কিন্তু দৈত্য তাকে নিয়ে ছুটল।

রাত যখন দুপুর হল, তখন সেই দৈত্য সেই বামনকে ফেলে দিল খুব বড় একটা বাড়ির ছাদের উপর।

সেই বাড়ি ছিল একজন রাজার বাড়ি।

সেই রাজার মেয়ের নাম মায়ামোহিনী। তখন সেই ছাদের উপর হাওয়া খাচ্ছিল।

যে দৈত্য সেই বামনকে সেই ছাদের উপর ফেলে দিল, সেই দৈত্য ছিল খুবই দয়ালু। তাই তার দয়ার জন্যই ছাদের উপর দুম করে পড়েও সেই বামনের গায়ে মোটেই আঘাত লাগল না।

সেই বামন সেইখানে পড়া মাত্র রাজকন্যা বলে উঠল,—"কে তুমি? কে তুমি?"

বামন বলে উঠল, "আমি দেবতার বর পেয়েছি। তাই এখন আকাশ থেকে পড়েছি।"

রাজকন্যার তখন তাক লাগল।

সে বলে উঠল, "তুমি দেবতার বর পেয়েছ? না, অপদেবতার বর পেয়েছ? কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?"

ঐ কথা বলতে বলতেই সেই রাজকন্যা দেখল, সেই বামন তখন আর সেই বামন নেই। সে তখন হয়ে পড়েছে খুব ভীষণ এক সাপ।

সেই সাপ তখন রাজকন্যাকে একটা কামড় মারবার জন্য ফোঁস করে ফনা ধরে উঠল। কিন্তু রাজকন্যা আর্তনাদ করল না। সে করল সিংহনাদ। সে হুংকার করে বলে উঠল,— ওরে শয়তান সাপ, কে তোর বাপ?—কে তোর বাপ?—তোর এমন সাহস যে, আমাকে

কামড়াতে চাস !—তোর মত সাপকে আমি সোলার মত মনে করি !

ঐ কথা বলতে বলতেই রাজকুমারী মায়ামোহিনী সেই সাপটার ফণাটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ঠিক একগাছা কুটোর মতই ধরে ফেলল।

আর সেই সাপ তৎক্ষণাৎ তার লেজ দিয়ে রাজকন্যাকে জড়িয়ে ধরল। আর তখন তখনই সেই সাপের শরীরে খুব বড়ো দুটো পাখা গজাল।

সাপটা তখন রাজকন্যাকে নিয়ে আকাশে উড়ল।

ঐভাবে ওরা কিছু দুর যাওয়ার পরেই হঠাৎ কোথা থেকে খুব বড় একটা বাজপাখি আকাশ দিয়ে উড়ে এল সেই সাপের সামনে।

সেই বাজকে দেখামাত্রই সেই সাপ একবারে "বাপ রে বাপ" ক'রে উঠে রাজকন্যাকে ছেড়ে দিল !

রাজকন্যা তখন এক লাফ দিয়ে চেপে বসল সেই বাজপাখির পিঠে।

বাজটি উড়ে চলল। অনেকক্ষণ পরে সে নেমে পড়ল একটা পাহাড়ের চূড়ায়। রাজকন্যাও তখন বাজপাখীর পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

ঠিক তখনই আকাশ থেকে সেখানে নেমে এল কয়েকজন সুন্দরীকন্যা।

সেই সুন্দরীদের দেখা মাত্র, সেই বাজপাখি আর বাজপাখি রইল না। সে হয়ে গেল অতি সুন্দর এক রাজপুত্র।

সুন্দরীরা তখন সেই রাজপুত্র আর সেই রাজকন্যাকে বলল, "তোমরা অনেক বিপদে পড়লে, অনেক সাহস দেখালে। এইবার পাবে তার পুরস্কার ! তোমরা হবে জয়সুখধাম নামক রাজ্যের রাজা ও রাণী। বিধাতা-পুরুষ তোমাদের জন্য সম্প্রতি সেই রাজ্য তৈরী করেছেন। সেই রাজ্য তৈরী করতে বিধাতা-পুরুষ কত টাকা খরচ করেছেন, তা জান? তিনি এই পৃথিবীটা বানাবার জন্য যত টাকা খরচ করেছিলেন, সেই জয়সুখধাম রাজ্যটি তৈরী করতেও ঠিক তত টাকা খরচ করেছেন।"

ঠিক সেই সময়ে এসে পড়ল কয়েকজন কিন্নর। তারা বলল, "ওহে রাজপুত্র, এখন থেকে তোমার নাম হল ৯৯।"

রাজকন্যা বলে উঠল,—ঐ নামের অর্থ গণিত অনুসারে—নিরানব্বই ?

একজন কিন্নর বলে উঠল,—হ্যাঁ, তা তো হয়ই। আর, স্বরবর্ণের ৯ অক্ষরটির অনুসারে ঐ নামকে নিরানব্বই না বলে, বলা যায়—৯৯ বা লিলি।

সুন্দরী বলে উঠল, নামটা তো বেশ মজাদার ! চমৎকার !"

সুন্দরীরা আর কিন্নরেরা তখন সেই রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে ফুলের রথে চাপিয়ে আকাশ-

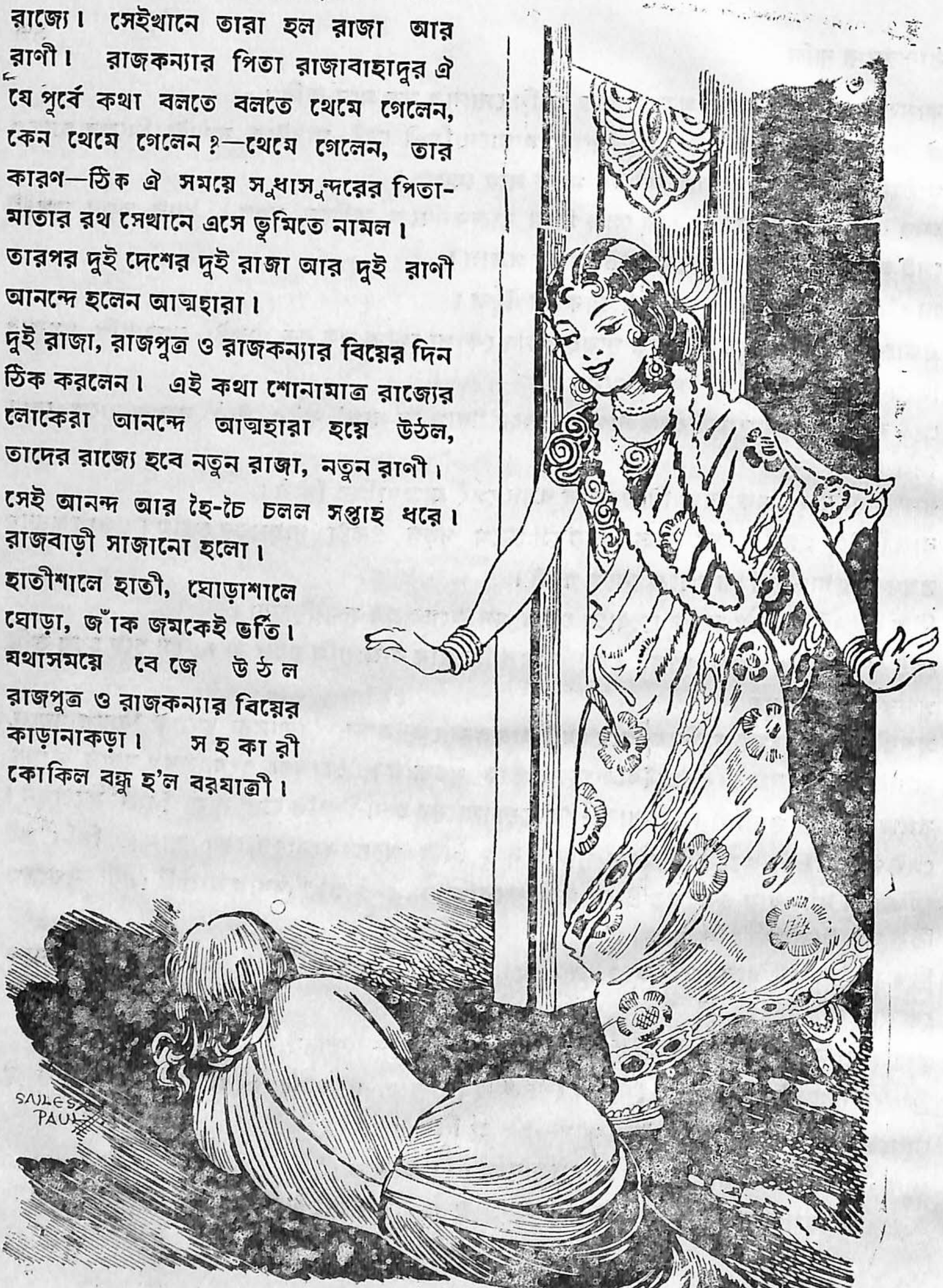
পথ দিয়ে নিয়ে গেল সেই জয়সুখধাম নামক রাজ্যে। সেইখানে তারা হল রাজা আর রাণী। রাজকন্যার পিতা রাজাবাহাদুর ঐ যে পূর্বে কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন, কেন থেমে গেলেন ?—থেমে গেলেন, তার কারণ—ঠিক ঐ সময়ে সুধাসুন্দরের পিতা-মাতার রথ সেখানে এসে ভূমিতে নামল।

তারপর দুই দেশের দুই রাজা আর দুই রাণী আনন্দে হলেন আত্মহারা।

দুই রাজা, রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিয়ের দিন ঠিক করলেন। এই কথা শোনামাত্র রাজ্যের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, তাদের রাজ্যে হবে নতুন রাজা, নতুন রাণী।

সেই আনন্দ আর হৈ-চৈ চলল সপ্তাহ ধরে। রাজবাড়ী সাজানো হলো।

হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, জঁাক জমকেই ভর্তি। যথাসময়ে বেজে উঠল রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিয়ের কাড়ানাকড়া। সহকারী কোকিল বন্ধু হ'ল বরযাত্রী।



মুকুরমালা





এক যে ছিলেন রাজা।

সেই দেশের নাম জয়ডঙ্কনগর। সেই দেশটির আর সেই রাজাটির নামটি হল কাঞ্চনকান্তি।

রাজা কাঞ্চনকান্তির আছে একটি কন্যা। তার নাম মুকুরমালা। মুকুরমালা দিন-রাত লেখে-পড়ে, গায়, কবিতা বানায়। কি রকম তার চেহারা?— এক জায়গায় ঠিক যেন হাজার ফুল-তারা।

মুকুরমালার বিয়ে হবে। কোন একদিন। কিন্তু কবে?

কত দেশের কত রাজকুমার রাজা কাঞ্চনকান্তির বাড়িতে আসে। তারা একজনে একশো রকম গুনের পরিচয় দেয়।

কিন্তু রাজার সেই মেয়েটির পণ আছে।—

কী সেই পণটি ?

সেই পণটি হল—যে লোক রাজকন্যার দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে, শুধু সেই লোকই হতে পারবে তার বর।—তা যে পারবে না, তাকে রাজকন্যা বিয়ে করবে না। কিন্তু মজা হল এই যে, কোন দেশের কোন রাজপুত্রই সেই মুকুরমালার দৃষ্টি থেকে নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে না।

কেন পারে না ?

পারে না, তার কারণ হল, মুকুরমালার আছে একখানি মুকুর বা আয়না। সে যেখানেই গিয়ে লুকোক না কেন, মুকুরমালা তার সেই আয়নার দিকে চায়, আর তখন তখনই সেই লুকোনো লোককে দেখতে পায়।

—তারপর কি হয় ?

তারপর সেই লুকোনো লোকটি পায় কতরকম ভীষণ শাস্তি। মারের চোটে ভাঙে তার দেহের হাড়। তারপর তাকে ফেলে রাখা হয় রাজা কাঞ্চনকান্তির রাজবাড়ির আশেপাশে।

অনেক রাজকুমারেরই ঐ দশা হয়েছে। তবু প্রায়ই নতুন নতুন রাজকুমার আসে। আর শেষ পর্যন্ত চোখের জলে ভাসে।

কোন একদিন, চন্দ্রচূড়নগরের রাজার ছেলে বীরচন্দ্র নানা দেশ বেড়াতে বেড়াতে এসে গেল সেই জয়ডঙ্কনগরে। তারপর জানতে পারল রাজকন্যা মুকুরমালার সেই পণের কথা। তাই শুনে রাজপুত্র বীরচন্দ্র ভয় পেল কি ? না। সে ভাবল, আমি তো পুরুষ! আমার প্রাণ কাঁপবে কেন! প্রাণ তো কাঁপে কাপুরুষের।

বীরচন্দ্র রাজবাড়ির কাছে চলে গেল। তখন সে দেখল, রাজকন্যা মুকুরমালা জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। যেন চাঁদ চেয়ে আছে! তার মুখটি যেন চাঁদটি!

রাজকন্যা মুকুরমালার চোখ পড়ল সেই বীরচন্দ্রের দিকে। রাজকন্যা বেপরোয়াভাবে বলে উঠল, "তুমি আমাকে বিয়ে করতে এসেছ ? কিন্তু আমার পণের কথা শুনেছ ?"

রাজপুত্র বীরচন্দ্রও বলে উঠল, "শুনেছি শুনেছি। ওসব পণকে আমি একটা ছেঁড়া কাগজের মতও মনে করি না। আমি কোথাও লুকিয়ে থাকব। তোমার যদি সাধ্য থাকে, তবে তোমার আয়নায় আমাকে দেখো। বুঝলে ?"

রাজপুত্রের ঐ রকম সাহসের কথা শুনে মুকুরমালা বেশ চটেই গেল। বলে উঠল,

"তাই নাকি? তা হলে যাও, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই লুকোও। তারপর আমার আয়নায় ধরা পড়। তারপর মারের চোটে যমের বাড়ির দিকে যাত্রা কর! যাও। যাও।"

রাজকুমার তখনই চলে গেল সেই নগরের পাশের সাগরের কূলে। তারপর জোর গলায় বলতে লাগল, "আয়, বন্ধু, আয়! আয়, বন্ধু আয়!"

তখনই সেই সাগরের জলে শুরু হল একটা ভীষণ আলোড়ন। সেই সঙ্গে সঙ্গেই এমন ভীষণ শব্দ হতে লাগল যে, সে যেন একসঙ্গে এক লাখ কামানের গর্জন! তারপর সাগরের জল থেকে আকাশের মেঘ পর্যন্ত উঠতে লাগল ভীষণ ধোঁয়া। তারপরেই সাগরের একেবারে ধারে ভেসে উঠল একটি মাছ। সে যে কত সুন্দর! কত সুন্দর!

মাছটি মানুষের ভাষায় বলল, "ওহে বন্ধু বীরচন্দ্র, তুমি একবার আমাকে ধরেছিলে! তারপর দয়া করে আমাকে না মেরে ফেলে ছেড়ে দিয়েছিলে! তোমার সেই ভাল কাজটির কথা কি আমি ভুলতে পারি। আমি জানি, তুমি এখন রাজকন্যা মুকুরমালার দৃষ্টি থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে চাও। বেশ তো। এখন এস আমার সাথে, সাগরের জলের তলায়।"

সেই সুন্দর মাছটি তখনই বীরচন্দ্রকে নিজের পিঠে তুলল। সাগরের তলদেশে নিয়ে গেল।

বীরচন্দ্র ভাবল, রাজকুমারী মুকুরমালা এখন আর আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না!

কিন্তু ঠিক সময়ে মুকুরমালা রাজবাড়িতে বসে তার আয়নার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। সে আকাশে দেখছে, পাহাড়ে দেখছে, বনে-জঙ্গলে দেখছে, পাতালে দেখছে। আরও কত জায়গায়, কত জায়গায়!

দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি চলে গেল সাগরে, সাগরের জলের ভিতরে। আর ঠিক তখনই তখনই সে দেখল, রাজকুমার বীরচন্দ্র সেখানে ঠিক যেন চন্দ্রের মতই রয়েছে! ওঃ রাজার মেয়ে মুকুরমালার তখন সে কি আনন্দ—উৎকট আনন্দ!

সে তখনই দিল কয়েকটা তুড়ি, শূন্য ছুঁড়ে মারল কয়েকটা পাথরের নুড়ি, আর বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ল ভুরি-ভুরি! আর তখনই বীরচন্দ্র সাগরের তলদেশ থেকে একটা হাউইয়ের মত আকাশে উঠে যেতে বাধ্য হল। তারপরেই এল সে রাজকুমারী মুকুরমালার সামনে!

মুকুরমালা বলে উঠল, "তুমি কোথায় লুকোবে,—যেখানেই লুকোও না কেন, আমার

৩

এই আয়না তোমাকে খুঁজে বার করবেই। যাক, তোমাকে আমি আর একবার লুকোবার চেষ্টা করবার সুবিধে দেব। যাও, যেখানে পার গিয়ে লুকোও।"

রাজপুত্র সেই রাজকন্যার কাছ থেকে চলে গেল।

যেন একটি সুন্দর পুতুলের কাছ থেকে আর একটি সুন্দর পুতুল চলে গেল।

রাজপুত্র ভাবতে লাগল! এখন কোথায় লুকোব? "কোথায়? আকাশে লুকোব, না, বাতাসে লুকোব, না বাতাসার মধ্যে লুকোব?" রাজপুত্র চলতে লাগল। কতকগুলি মৌমাছি তখন ছুটতে লাগল তার সাথে সাথে। কতকগুলি ময়ূরও চলতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। আর কতকগুলি বাঁদরও লাফাতে লাফাতে চলতে লাগল রাজপুত্রের সাথে সাথে।

রাজপুত্র কোথায় যে যাবে, তা কিছুই ভেবে পায় না।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্য অস্ত যায়, পাখিরা বাসায় ফিরে আসে, সেই সময়ে সেই রাজপুত্র বীরচন্দ্র খুব বড় একটা বনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

তখনই কোথা থেকে কে জানে, খুবই সুন্দরী একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল রাজপুত্র বীরচন্দ্রের সামনে। সেই মেয়েটিকে দেখে রাজপুত্র ভাবল—এ তো চাঁদের মতোই সুন্দর! সেই মেয়েটি অমনি বলে উঠল, "ওহে রাজপুত্র, তুমি ভাবছ, আমি চাঁদের মত সুন্দর! আর আমি ভাবছি, তুমি কার্তিকের মত মনোহর!"

মেয়েটির কথা শুনে রাজপুত্র একটু হাসল।

মেয়েটি বলে উঠল—"ওহে রাজপুত্র, এখন তো চারদিক থেকে অন্ধকার ঘিরে আসছে। তুমি এখন কোথায় যাবে? তুমি কি এখন আমাদের ঘরে আশ্রয় নিতে চাও?"

"হ্যাঁ, আশ্রয় চাই!" রাজপুত্র অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলল।

রাজপুত্রের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখল, সেই মেয়েটি আর সেখানে নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে খুব ভীষণ চেহারার এক সিংহ।

সেই সিংহ মানুষের মত বলে উঠল, "ওহে রাজকুমার আমি তোমাকে খেয়ে ফেলতে চাই। কিন্তু মুখে পুরেই গিলে ফেলব না। আমি তোমাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব। যদি তুমি আমার এই কথায় রাজী থাক, তা হলে তুমি সেই রাজকন্যার দৃষ্টি থেকে হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারবে।" রাজপুত্র বলে উঠল, "পারব লুকিয়ে থাকতে? পারব?"

সিংহ লেজ নাড়তে নাড়তে বলল, "হয়তো পারবে। কিন্তু আমি যে তোমাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব, সেই বিষয়টা ভেবে দেখছ তো?"

"হ্যাঁ, তা ভেবে দেখেছি! কিন্তু আমি জানি, দুঃখ ভোগ না করলে সুখ লাভ করা যায় না।"

গভীর সাগরে ডুব না দিলে মাণিক তোলা যায় না। অন্ধকার খনির ভিতরে না ঢুকলে মণি লাভ করা যায় না।"

সিংহ বলে উঠল, "তা হলে তুমি সেই রাজকন্যার পণ বানচাল করে দিতে প্রস্তুত ? তা হলে এখনই ঢোক আমার মুখের মধ্যে।" বলতে বলতেই সেই ভীষণ সিংহমশাই তার মুখ হাঁ করল। সেই হাঁ-টা এত বড় হাঁ যে, সেই হাঁয়ের মধ্যে খুব লম্বা একটা তালগাছ দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই হাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে উদ্যত হল। পরক্ষণেই সে দেখল একটা জঙ্গল। সে সেই জঙ্গলের মধ্যে এক ডাইনী বুড়ীর আস্তানায় উপস্থিত হল! ডাইনী তখন বড় বড় বাতাসা তৈরি করছিল।

ডাইনী বলে উঠল, "ওহে রাজপুত্র, তুমি এখন একটা বাতাসার মধ্যে ঢুকবে ? তাহলে হয়তো সেই রাজকন্যা আর তোমাকে দেখতে পাবে না।"

রাজপুত্র বলে উঠল, "বাতাসার মধ্যে আমি একটা মানুষ হয়ে কি করে ঢুকব ?"

ডাইনী বুড়ী একটা ভীষণ হাসি হেসে উঠল। তার সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই একটা খুব বড় বাতাসা খুব বড় করে একটা হাঁ করল।

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ ঢুকে পড়ল সেই বাতাসার মধ্যে! অমনি সেই বাতাসার মুখ বুজে গেল। রাজপুত্র তখন হল সেই বাতাসার মধ্যে বন্দী।

এদিকে সেই রাজকন্যা তখন সেই আয়নাটি তার চোখের সামনে ধরল।

সেই আয়নার ভিতরে সে তখন একটা হায়না দেখছে ; তার পেটের মধ্যেও চেয়ে দেখছে। কিন্তু সেই রাজকন্যা সেই রাজপুত্রকে সেই হায়নার পেটের মধ্যে দেখতে পেল না।

রাজকনা তখন তার আয়নার মধ্য দিয়ে নানা জায়গায় দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

আলুর মধ্যে বালুর মধ্যে আরও কত জায়গায় সে দৃষ্টিপাত করল।

কিন্তু রাজপুত্র সেই রাজকন্যার চোখে পড়ল না। রাজকন্যা তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়ল।

সে তখন আবার খুব ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগল তার সেই আয়নার মধ্যে।

এইবার হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি চলে গেল সেই জঙ্গলে, ডাইনীর আস্তানায়, আর সেই বাতাসায়। রাজকন্যা দেখল, রাজপুত্র বীরচন্দ্র বাতাসার মধ্যে বসে আছে।

তখন স্ফূর্তির চোটে রাজকন্যা একেবারে হৈ-চৈ করে উঠল। "এইবার তোমায় ধরে ফেলেছি! এইবার ধরে ফেলেছি।" বলতে বলতে, রাজকন্যা একেবারে নাচতে লাগল।

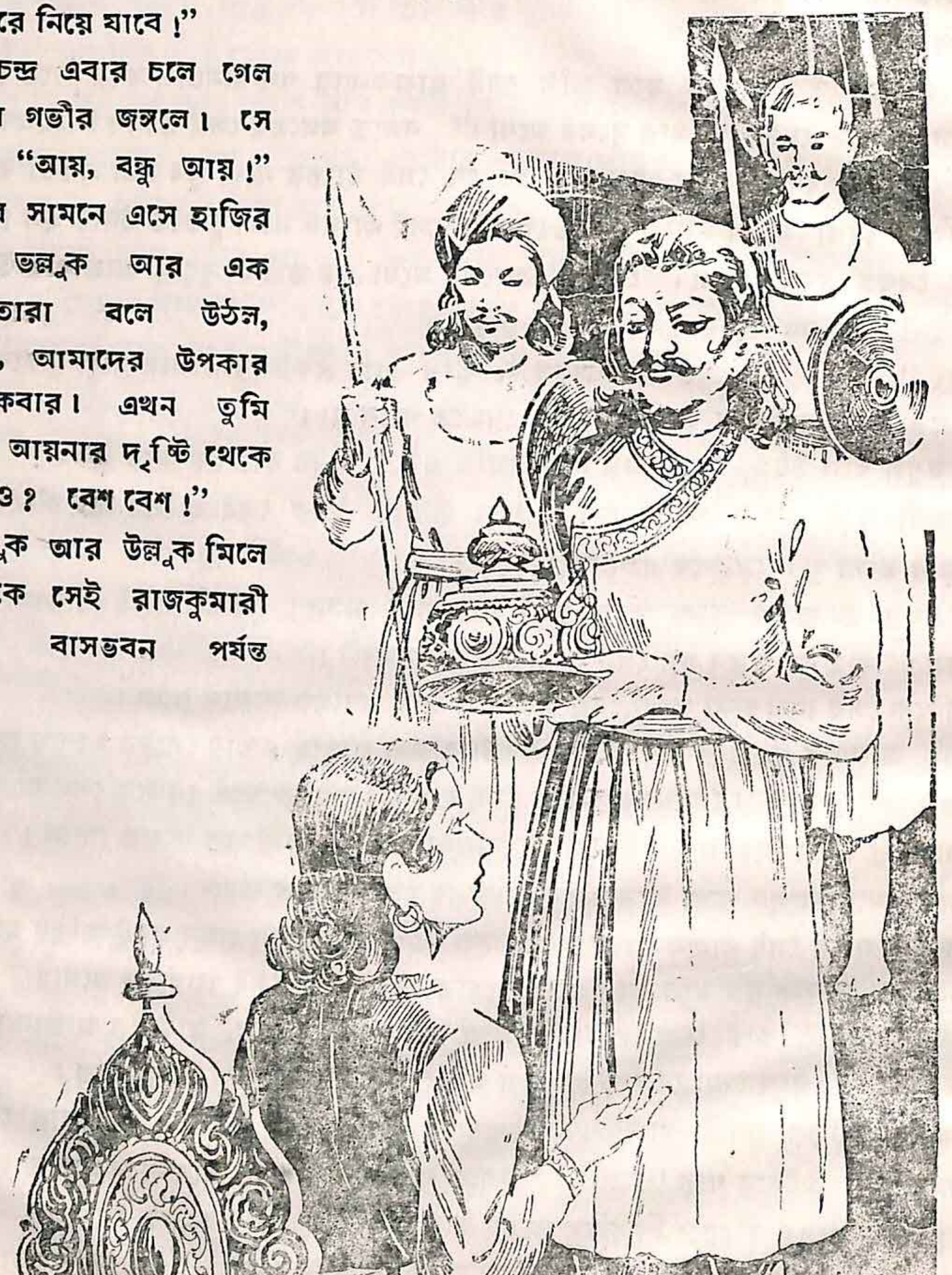
তারপর রাজপুত্র বীরচন্দ্র কিছুক্ষণ পরেই এসে হাজির হল রাজকন্যার সামনে।

রাজকন্যা বলে উঠল, "এবারও তুমি আমার কাছে হেরে গেলে! কিন্ত আমি তোমাকে এবার কোন শাস্তি দিতে চাই না। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমার দৃষ্টি থেকে আর একবার

লুকোবার চেষ্টা কর। কিন্তু এইবারও যদি তুমি আমার আয়নায় ধরা পড়, তা হলে যম তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

কুমার বীরচন্দ্র এবার চলে গেল আর একটা গভীর জঙ্গলে। সে ডাক দিল, "আয়, বন্ধু আয়!" তখনই তার সামনে এসে হাজির হল এক ভল্লুক আর এক উল্লুক। তারা বলে উঠল, "রাজকুমার, আমাদের উপকার করেছ একবার। এখন তুমি মুকুরমালার আয়নার দৃষ্টি থেকে লুকোতে চাও? বেশ বেশ!"

তখনই ভল্লুক আর উল্লুক মিলে সেখান থেকে সেই রাজকুমারী মুকুরমালার বাসভবন পর্যন্ত



একটা গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলল। তারপর রাজপুত্র বীরচন্দ্র সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে চলে গেল। চুপটি করে বসে রইল।

এদিকে রাজকন্যা মুকুরমালা তখন তার আয়নাটার দিকে চেয়ে জগতের সব জায়গায় দৃষ্টি দিল। কিন্তু একি! সে তো কোন জায়গাতেই বীরচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছে না!

কি করে দেখতে পাবে? বীরচন্দ্র যে সুড়ঙ্গের ভিতরে রাজকুমারী মুকুরমালার পায়ের ঠিক নীচেই রয়েছে! নিজের পায়ের নীচে মুকুরমালা তার আয়নার দৃষ্টি মোটেই ফেলে না। তাই লুকানো বীরচন্দ্রকে দেখতেও পেল না!

মুকুরমালা তখন রেগে গেল। তার সে কি রাগ! রাগের চোটে আয়নাটাকে মারল একটা আছাড়। আয়না হল চুরমার! আর ঠিক তখনই তার সামনে এসে দেখা দিল বীরচন্দ্র রাজকুমার। বলে উঠল সে, "এইবার রাজকন্যা, তোমার হল হার!"

রাজকন্যা মুকুরমালা তখনই খুলল তার গলার মুক্তার হার, পরিয়ে দিল বীরচন্দ্রের গলায়। মুকুরমালার সখীরা বলে উঠল, "ও, দুটিতে বেশ মানায়!"

তখনই রাজবাড়ীতে আপনা থেকে বেজে উঠল ঢাক-ঢোল, শিঙ্গা, বাঁশি; আর সকলের মুখেই ফুটে উঠল হাসি।

ম'রে পড়ে থাকা আগেকার সেই রাজপুত্ররাও উঠল বেঁচে। তারা করে উঠল জয়ধ্বনি।

তারপর, বিয়ে হল—রাজার ছেলে আর রাজার মেয়ের সঙ্গে।

ছয়মাস, ধরে চলল সেই বিয়ের উৎসব আর ভোজ, রোজ-রোজ!



টুলটুল ফুলপরী

সেই যে গজাইপুরের ভজাই ভাই, তার ছিল একটি মেয়ে। তার রূপ ছিল এমন যে, চাঁদ থাকত তার দিকে চেয়ে! কত সব বুলবুল সেই মেয়েকে এনে দিত কত সব ফুল!

গজাইপুরের ভজাই ভাইয়ের সেই মেয়েটির নাম ছিল তাক-লাগানো ধরনের। সেই নামটি হ'ল চক্‌চকি। তার ছিল এক দিদিমা। সে যেখানে থাকত, সেই গাঁয়ের নাম ছিল পাকুরগাঁ। একদিন সুন্দরী চক্‌চকির মা তাকে বলল, "ওগো আমার সোনামণি, এখনই তুমি তোমার দিদিমাকে কিছু পিঠেপুলি দিয়ে এস! যাও পথে যেন কোন কিছু দেখেই ভয় না পাও!"

সুন্দরী চক্‌চকি বলে উঠল, "ভয় পাব না।"

সুন্দরী মেয়েটি তখনই চলে গেল। যেন এক ঝলক বিজলী খেলে গেল!

চক্‌চকি পিঠে নিয়ে চলতে লাগল। তার পথে পড়ল একটা বন। মেয়েটি সেই বনে ঢুকল। তখনই বিকট চেহারার একটা বেঁটে বামন তার সামনে এসে বলল, "ওগো সোনার মেয়ে, আমাকে শোনাও না একটা গল্প। আমি তোমায় চিনি। তুমি তো যেন মিষ্টি চিনি!"

সেই বামনটা ছিল আসলে একটা রাক্ষস। কিন্তু সরলমনা চক্‌চকি তা কি করে বুঝবে? সে খুব মিষ্টি দু'একটি গল্প বলতে লাগল।

এই দেশে বা সে দেশে বা ঐ দেশে এক সময়ে ছিল একটা খুব বড় জঙ্গল। লোকে বলত এই জঙ্গলে আছে খুব বড় একটা বাঘ! কিন্তু এই জঙ্গলের কাছ দিয়ে যদি কেউ যায়, তবে সেই বাঘ তাকে খায়।

একদিন ভূতপেত্নী নামে একটি লোক কোথায় যেন যাচ্ছিল। সে সেই জঙ্গলের কাছে এসে পড়ল। তখনই তার মনে পড়ল, এই জঙ্গলটাকে লোকে বলে যমজঙ্গল। এই জঙ্গলের কাছ দিয়ে যে যায়, বাঘ তাকে নিজের পেটের ভিতরে করে যমের বাড়ি নিয়ে যায়!

ঐ কথা মনে পড়তেই পথিক ভূতপেত্নী ভাবল, সর্বনাশ! এখনই হয়তো এই বন থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে আমাকে ধরবে। তারপর আমাকে স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে! সুতরাং আমি এখন দৌড়াই! ভূতপেত্নী তখনই দৌড় শুরু করে দিল।

সেই জায়গায় তখন একটা ছাগল কচি ঘাস নাশ করছিল—। সে সেই লোকটিকে দৌড়তে দেখে ভাবল, এখানে তো ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই। তবু ঐ লোকটি ছুটছে কেন? ওই লোকটি নিশ্চই ভয় পেয়ে দৌড়াচ্ছে। মানুষেরা আমাদের মারে। তারপর সিদ্ধ করে, পেটের ভিতরে ভরে। সুতরাং আমি এখন ঐ লোকটাকে তাড়া করব। আমার শিং দিয়ে ওকে ঢুঁ মারব। ওর নাড়ী-ভুঁড়ি বের করে দেব!

ঐ কথা ভাববার সঙ্গেই সেই ছাগল সেই ভূতপেত্নীর পিছনে পিছনে দৌড়াতে আরম্ভ করল। সেইখানে কাছেই একটা গরুও তখন ছিল। মানুষের পিছনে ছাগলকে ছুটতে দেখে, সেই গরু

ভাবল,—ছাগল কেন একটা পাগলের মত হয়ে ঐ লোকটার পিছনে ছুটছে? নিশ্চয়ই এর কিছু কারণ আছে। সুতরাং আমারও এখন ঐ লোকটার পিছনে ছোটা দরকার! দেখি কি ব্যাপার!

ঐ কথা ভেবে, সেই গরুও তখন ছুটল সেই ভূতপেত্নীর পিছনে।

এদিকে ভূতপেত্নী তো তখন তার পিছনের দিকে ফিরে চাইছে না। সে শুধু ছুটছে আর ছুটছে!

ঐ সময়ে একটা কুকুর সেইখান দিয়ে তার বৌ-কে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল।

মানুষের পিছনে ছাগল আর গরুকে ছুটতে দেখে কুকুর ভাবল,—আমিও এখন ঐ লোকটার পিছনে ছুটি। ওর রক্ত আর মাংস দিয়ে একটু মজা লুটি।

ঐ কথা ভাবতে ভাবতে কুকুরমশাই বৌ-কে রেখে ছুটল ভূতপেত্নীর পিছনে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক চোর তখন বেরিয়েছে রাতের কাজ-কারবার করতে।

সে, সেই ভূতপেত্নী আর ছাগল আর গরু আর কুকুরের দৌড় দেখে ভাবল—ঐ যে লোকটা ছুটছে, ঐ ছাগল আর গরু আর কুকুর। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক টাকাকড়ি রয়েছে। ঐ লোকটা আমাকে দেখতে পেয়েই ভয় পেয়ে, ভয় খেয়ে এখন তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা করছে। সুতরাং আমার এখন একটা দৌড় দিয়ে ঐ লোকটাকে ধরে ফেলা দরকার। তাহলে ওর কাছ থেকে অনেক টাকা-কড়ি পেয়ে যাব।

ঐ ভেবে সেই চোরও তখন ছুটল সেই ভূতপেত্‌নীর পিছনে পিছনে।

এদিকে, ভূতপেত্‌নী তখন বাঘের মজার খানা হওয়ার ভয়েতে এমনিই অস্থির যে সে আর পেছন দিকে তাকাচ্ছে না। সে শুধু ছুটছে আর ছুটছে।

ইতিমধ্যে সেই চোর সেই ভূতপেত্‌নীর একেবারে কাছে এসে পড়ল।

সেই চোরের পায়ের শব্দ শুনে ভূতপেত্‌নী এইবার তার পিছন দিকে ফিরে চাইল।

তখন সে দেখে যে, তার পিছনের সেই লোকটি আর কেউ নয়। সে হচ্ছে তার খুবই চেনা লোক সে!

ভূতপেত্‌নী বলে উঠল,—"তুমি! তুমি ছুটছ আমার পিছনে!"

যম অবাক্ হয়ে বলল—"তুমি! আমি ছুটেছি তোমার পিছনে। এ কি কাণ্ড!"

ওদের ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন বলে উঠল,—"এ হচ্ছে বোকার কাণ্ড!"

—বোকার কাণ্ড! এই কথা শোনামাত্র ছাগল, গরু, কুকুর তারা ফিরে গেল যে যার বাড়ী। ভূতপেত্‌নী আর যম তখন উপর দিকে চেয়ে দেখল,—শিবের শিষ্য নন্দী আর ভৃঙ্গী তখন

আকাশে নাচছে ধেই ধেই করে! খুকি তখন হাসি-খুশির আর একটি গল্প না বলে ছাড়ল না। কোন এক দৈত্য-দানবদের দেশ। সেখানে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, বড় বড় হাঁড়ি এবং আরও কত কিছুই না আছে। সেখানে দৈত্য-দানবদের ছেলেমেয়েরা নাচে গাছে গাছে। দৈত্য-দানবেরা মানুষের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট খায়; মানুষের ভুঁড়ি দিয়ে ভুঁড়িঘণ্ট খায়। সেই মুড়িঘণ্ট তাদের খুবই খুশির খাবার।

দৈত্য আর দানবেরা গরুকে বলে পশুদের গুরু! সেই গুরুকে তারা পোষে। তারা গুরুর গৌরবের গান গায়, আর মাদল বাজায়!

এক দানবের নাম দণ্ডভণ্ড। সেই দানবের বউয়ের নাম ভণ্ডীভণ্ডী! তাদের এক ছেলের নাম আজবগুজব।

একদিন সেই আজবগুজবের মা তাকে বললে, "ওরে বাছা, আমাদের গরুটাকে নদীর বাঁকে দুইটা জঙ্গলের ফাঁকে বেঁধে রেখে এসেছি। তুই একবার দেখে আয় তো, গরুর স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে।" আজবগুজব বলল—"যাই মা, এখনই যাই!"

আজবগুজবের ছোট ভাইয়ের নাম ভুতভেল্কিলাল। আজবগুজব তাকে বলল,—"চল আমার সঙ্গে।" তখন দুই ভাই চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর আজবগুজব ভুতভেল্কিলালকে বলল,— "উত্তরে মাঠটার ঝোপের কাছে নাকি একটা কুলগাছ আছে। সেই গাছে নাকি অনেক কুল পেকে গিয়ে আনন্দে একেবারে আকুল হয়ে আছে! চল, সেখানে যাই, কুল খাই। তারপর আমাদের গরুটার কাছে যাব।"

ভুতভেল্কিলাল বলে উঠল,—"কিন্তু মা যে এখনই গরু দেখতে যেতে বলেছে! গরুর কাছে না গিয়ে কি কুল খেতে যাব?"

আজবগুজব বলে উঠল,—"কয়েকটা কুল কুলগাছ থেকে পেড়ে নিতে আর কত সময় লাগবে রে! তাড়াতাড়ি কয়েকটা কুল পেড়ে তারপর গরু দেখতে গেলে এমন কি ক্ষতি হবে রে?" তখন দুইজনে আর গরুর কাছে গেল না। তারা চলল তাদের কুলগাছের কাছে।

চলতে চলতে কুলের কথা বলতে বলতে আজবগুজব বলল,—"কুলগাছে যতগুলো পাকা কুল পাব, সেই সবগুলো পেড়ে নিয়ে আসব।"

ভুতভেল্কিলাল তার দাদার কথায় সায় দিল না! মাথা নেড়ে বলল,—"সব পাকা কুল পাড়তে যে অনেক সময় লেগে যাবে! মা যে এখনই গরুটাকে দেখতে যেতে বলেছে।

আজবগুজব সে কথায় সায় দিল না। "আরে গরু দেখতে তো যাবই রে। সময় কি আর চলে যাচ্ছে?—সারাদিনই তো রয়েছে। গরু দেখবার সময় ঢের আছে!"

কিছুক্ষণ পরেই আজবগুজব আর ভুতভেল্‌কিলাল সেই কুলগাছের গোড়ায় পেঁাছে গেল। তখন দেখল,—কুলগাছে পাকা কুল তো নেই-ই, এমন কি, কাঁচা কুলও নেই, আছে শুধু পাতা। ভুতভেল্‌কিলাল বলে উঠল,—"কি রে দাদা, কুল কই? তুই সবই ভুল শুনেছিস।"
আজবগুজব একটু সময় ধরে কি যেন ভাবল। তারপর বলল,—"রাক্ষসী মাসীর মাসতুতো ভাই আমাকে বলেছিল, এইখানেই গাছে পাকা কুল পেকে রয়েছে!"

দুই ভাই যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সেখান থেকে দূরে কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়েছিল। ভুতভেল্‌কিলালকে সেই গাছ কয়টা দেখিয়ে আজবগুজব বলল,—"ঐ যে দূরে গাছ দেখা যাচ্ছে; রাক্ষসী মাসীর মাসতুতো ভাই বোধহয় ঐ গাছের কথাই আমার কানে ঢুকিয়েছে। এখন চল ওখানে।—ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের পাকা কুল দু-চার দশটা পাবই।"
ছোট ভাইটি বড় ভাইটির কথাটা ভাল বলে মনে করল না। বলল,—"দাদা, মা যে এখনই গরু দেখতে যেতে বলেছে রে!—ঐ যে গাছ দেখা যাচ্ছে, ও তো অনেক দূরে। ওখানে গেলে আমাদের গরু দেখতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে!"

"একটু পরে গরু দেখতে গেলে, গুরুতর দোষ কিছু হবে না!—গরু তো মাঠে ঘাস খাচ্ছে। চল, আমরা কুল খেয়ে আসি!"—বলতে বলতে আজবগুজব সেই দূরের গাছের দিকে চলতে লাগল। ভুতভেল্‌কিলাল তখন কি আর করবে। সেও চলল সেইদিকে।

কিছুকাল পরে দুইজনে সেই গাছ কয়টার কাছে গিয়ে হাজির হল!

কিন্তু কোথায় সেই কুলগাছ! সেখানে রয়েছে শুধু কয়েকটা ফুলগাছ।

ভুতভেল্‌কিলাল বলে উঠল, "দাদা, তুই ভেবেছিলি, খাবি কুল!—এখন দেখলি তো তোর ভুল?
আজবগুজব হার মানতে চাইল না। বলে উঠল,—"কুল না পাই ফুল তো পেলাম! —চল, এখন গরুর কাছে যাই।" তখন চলল দুইজনে সেখান থেকে। কিছু দূরে তারা চলে গেল, তখন একটা গরুর হাম্বা হাম্বা ডাক তাদের কানে এল।

ভুতভেল্‌কিলাল বলল,—"দাদা, আমাদের গরুটা ঐ শব্দ করছে না কি? গরুটার ডাক শুনে মনে হচ্ছে গোরুটার কোন বিপদ হয়েছে।"

কিন্তু আজবগুজব তার ছোট ভাইয়ের সেই কথাটায় তেমন আমল দিল না। সে বলল, "আমাদের গরু তো ওদিকে নয়। ও হয় তো অন্যের গরু।"

তারা তখন তাড়াতাড়ি চলল। নদীর সেই বাঁকে, পেঁাছে গেল দুই জঙ্গলের ফাঁকে।

তখন দেখল, অনেকের গরুই সেখানে ঘাস বেশ নাশ করছে। কিন্তু তাদের গরু সেখানে নেই। আজবগুজব নিজে নিজে বলে উঠল, "আমাদের গরুজী গেল কোথায়।"

ভূতভেল্‌কিলালের মুখে একটা আশঙ্কার ভাব দেখা দিল।
সে বলল, "ঐ যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করছিল, ঐটিই হয়তো আমাদের সেইটি!"
আজবগুজব বলে উঠল, না না। সে গরুটি আমাদের নয়। আমাদের গরুটির ডাক শুনলে আমি বুঝতে পারি। আমাদের গরু এই কাছেই কোথাও আছে।
এই বলে আজবগুজব তখন জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে উঁকি দিতে লাগল। কিন্তু তাদের গরুটির দর্শন পেল না। তখন তারা দুইজনে চলল সেই ফুলগাছগুলোর দিকে।

সেখানে যেতে যেতে একটা গরুর ডাক আবার তাদের কানের ভিতরে চলে গেল।
গরুর সেই ডাক শুনে ওদের মনে হল, গরু যেন তার শিংওয়ালা, লেজওয়ালা জীবনের শেষ লীলাখেলা খেলছে!
গরুর ডাক যেদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল, আজবগুজব তখনই সেইদিকে দৌড় দিল।
ভূতভেল্‌কিলালও ছুটল। তারা নদীর তীরে উপস্থিত হল।
তখন নদীর জলের মস্তবড় এক কুমীর তাদের দেখিয়ে দিল, তারা যাকে খুঁজছে, সেই গরুটি কুমীর মহারাজের মুখের মধ্য দিয়ে কুমীর মহারাজের পেট-প্রদেশে বেড়াতে যাচ্ছে!
আজবগুজব আর ভূতভেল্‌কিলাল তখন তাদের গরুর পক্ষ হয়ে কুমীরকে অনেক শাসাল, অনেক বোঝাল, খুন করবে বলে ভয়ও দেখাল।

কিন্তু কুমীর সেই গরুকে ছাড়ল না। সে বলে উঠল, "গরুর গৌরব কত। গৌরবওয়ালা গরুজীকে কি আমি একটু আদর-অভ্যর্থনা না করে ছেড়ে দিতে পারি!
জয় গরুর জয়! কুমীর মহারাজের পেটের মধ্যে গরুর কত সমাদর হল!
কান দিয়ে ও মন দিয়ে গল্প পান ক'রে সেই বেঁটে বামন তখন খুশির ভাব দেখিয়ে বলল, "ওগো সুখী খুকি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?"

সুখী খুকি চক্‌চকি বলল, পাকুর-গাঁয়ে তার দিদিমার কাছে সে যাচ্ছে, পিঠে নিয়ে।
ফাঁকিবাজ শয়তান বেঁটে বামনটা বলে উঠল, "এই বনটা কত চমৎকার! এখানে ফুল ফুটেছে হাজার হাজার! এই ফুল তুমি নেবে না তোমার দিদিমার জন্য?

সরলমনা মেয়ে চক্‌চকি বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। দিদিমার জন্য কতকগুলি ফুল এখন তুলি।"—বলেই, সে ফুল তুলতে লাগল। ফুলের সাথে সে যে ফুলের মত মিশে গেল।

এদিকে হল কি,—সে বামনটা তখনই চলে গেল পাকুর-গাঁয়ে চক্‌চকি ফক্‌ফকির সেই বুড়ী দিদিমার কাছে। সেই বুড়ী তখন ঘরের বাইরে বসে তার সেই নাতনিটির জন্য নানা রকমের কয়েকটা পুতুল ও খেলনা তৈরী করছিল। বামনটাকে দেখেই, বুড়ী বুঝতে পারল, সেটা

আসলে একটা রাক্ষস। বুড়ী তখন তার ঘরে ঢুকবার জন্য দিল দৌড়। কিন্তু বামনটা তখনই একটা রাক্ষস হয়ে গেল, আর সেই বুড়ী তার পেটে চলে গেল। সেই বুড়ীকে খেয়ে, রাক্ষসের ভুঁড়ি বেশ ফুলে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে চক্‌চকি বন থেকে অনেক ফুল নিয়ে সেখানে এসে পড়ল।

আর ঠিক তখনই রাক্ষসটা তাকে ধরল। তার বিকট মুখটা হাঁ করল মেয়েটিকে গিলবে বলে। চক্‌চকি চীৎকার করে উঠল,—দিদিমা, দিদিমা, তুমি কোথায় ? তুমি কোথায়।''

রাক্ষসটা বিকট হাসি হেসে তার ভুঁড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, ''আমার এই ভুঁড়ির ভিতরটায় তোর দিদিমা এখন রয়েছে তোরই অপেক্ষায় !''

ঐ কথা শুনে চকচকি করে উঠল 'হায়, হায় !',

আর ঠিক সেই সময়, চক্‌চকি তুলে আনা সব ফুল মিলে মূর্তি ধারণ করল এক বীর তরুণের। সেই বীর তরুণ আর সেই রাক্ষসটার মধ্যে লড়াই লাগল ! যুদ্ধের হুংকার মার-মার শব্দের চোটে কত গাছপালা শূন্যে উঠে গেল ! রাক্ষসটাও অক্কা পেল !

সেই বীর তরুণ তখন চক্‌চকির ফুলের মত একটি হাত ধরে বলল, ''আমি বন-দেবতার ছেলে। আর আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলুম টুলটুল ফুলপরী। এই নাও তুমি অনেক ধনরত্ন, টাকাকড়ি ! তোমার দিদিমাকেও আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি।''—এই বলেই, সেই বীর তরুণটি বলে উঠল, "রাক্ষসটার ভুঁড়ি দু'ভাগ হয়ে যাক !" তখন সেই ভুঁড়ি দু-ভাগ হয়ে গেল। বুড়ী দিদিমা সেখান থেকে বেরিয়ে এল।



চারভাইচমচম

যেখানে আকাশ আর পাহাড় মেশে আর মেঘে মেঘে বিজলী ওঠে হেসে, সেইখানে রে সেইখানে ! আমাদের গল্প হল সেইখানে এবার শুরু হ'লো এইখানে ।

সেইখানে চকচকে চম্পা নামক এক নগরে বুড়োর ছিল চারটি ছেলে। তাদের নাম ছিল রংচম্‌চম্‌, সঙচম্‌চম্‌, ঢঙচম্‌চম্‌ আর টংচম্‌চম্‌।
লোকে তাদের বলত চারভাই চম্‌চম্‌।

চারভাই চম্‌চম্‌-এর বুড়ো বাবার নাম ছিল ভীমঢাকঢক্‌কা। একদিন সেই বুড়ো তার চার ছেলেকে একসাথে ডেকে বলল, "তোমরা হয়ে উঠেছ বড়। তাই এখন কিছু কাজকর্ম কর। দূর দূর দেশে চলে যাও। দেখ সেখানে কি পাও। পা চালা, চলে যা! এমন কিছু শিখে আয়, যাতে সবাই তোদের গুণ গায়!"

চারভাই চম্‌চম একসাথে বলে উঠল, "ঠিক, পিতা, ঠিক বলেছেন আপনি! আমরা এখনই আপনার আদেশ পালন করব। চললুম আমরা।"
চারভাই চম্‌চম্‌ তাদের পিতাকে প্রণাম করল। চলল তারা ঠিক যেন চারটি তারা।

চারভাই চম্‌চম্‌ একসাথে অনেক দূর চলে গেল। তারপর তারা ঠিক করল, একসাথে তারা আর যাবে না চারজন যাবে চারদিকে। দেড়শো দিন পরে তারা আবার এসে উপস্থিত হবে ঠিক এই জায়গায়।
চারভাই চারদিকে চলে গেল।

বড় ভাই রংচম্‌চম্‌ একটা পাহাড় পার হয়ে গিয়ে, হঠাৎ দেখে কি, তিন মাথা, তিনঠ্যাংওয়ালা কে একজন তার দিকেই আসছে আর হাসছে।

রংচম্‌চম্‌ চম্‌কে গেল, থমকে দাঁড়াল। সেই তিন মাথা তিন ঠ্যাংওয়ালা তার কাছে এসেই বলে উঠল, "চিনি, চিনি, তোকে চিনি! তুই তো কিছু শিখতে চাস। বেশ, বেশ! তোকে আমি এখনই একটা বিদ্যে শিখিয়ে দিচ্ছি। সেই বিদ্যার বলে তুই অন্যের অদেখা হয়ে যে-কোন কাজ করতে পারবি।" ঐ কথা বলতে বলতেই সেই তিন ঠ্যাংওয়ালা শূন্যে থাবা মেরে খপ্‌ করে একটা ফড়িং ধরল, আর রংচম্‌চম্‌-এর নাকের ভিতরে সেটা ঢুকিয়ে দিল। আর তখন তখনই সেই ফড়িংটা রংচমচমের কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিন ঠ্যাংওয়ালা বলে উঠল, "যা, তোর হয়ে গেল বিদ্যে শেখা।" বলতে বলতেই, ভূতের মত অদ্ভুত সেই জীবটি লম্বা লম্বা পা ফেলে আকাশে উঠল, ঘোর বেগে ছুটল।

এবার জানতে হবে, চার ভাইয়ের দ্বিতীয় ভাই সঙচমচম-এর কি হল। সঙচমচম পথে চলতে চলতে চলে গেল অতদূর, ততদূর! তখন দেখতে পেল একটি ময়ূর। সঙচমচমকে দেখা মাত্রই, সেই ময়ূর বিড়ালের মত দু'চারবার ম্যাঁও ম্যাঁও করল। তারপর মানুষের ভাষায় বলল,—"শিখতে চাও? শিখতে চাও! আচ্ছা, তা হলে এখানে তেরবার ডিগবাজি

খাও। তারপর চলে যাও। অন্ধকারে বা পাতালে বা যে কোনখানেই যা থাকুক না কেন, তুমি তোমার বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে! তেরবার ডিগবাজি খেল সঙচমচম।—তার বিদ্যে শেখা হয়ে গেল। সে সেই ময়ূরের কাছ থেকে পেল একখানি আয়না। সে সেই আয়নায় জগতের সবকিছুই দেখতে পাবে, তা সব যেখানেই থাকুক না কেন।

তৃতীয় শ্রীমান শ্রীযুক্ত ঢঙচমচম এতক্ষণে এতদিনে চলে গেল এক পাহাড়ের পায়ের কাছে। তখনই সে দেখল, সেখানে দৈত্য নাচে আর হাঁচে। সেই নাচা-হাঁচা দৈত্যটা ঢঙচমচমকে বলে উঠল, "আয়, আয় আয়! বিদ্যে শেখার সময় যে চলে যায়! তোর হাতে আমি এখনই দেব তীর-ধনু! তুই হবি মহাবীর হনু। মারবি প্রাণ, দুষ্ট ও দুশমনদের করবি খান খান। তুই এখন নাচ আর হাঁচ।"

শ্রীমান শ্রীযুক্ত ঢঙচমচম তখনই কয়েকবার নাচল ও হাঁচল। দৈত্যের কাছ থেকে তীর-ধনু পেল।

চারভাই চমচময়ের ছোট ভাই টংচমচম এখন কোথায়? সে একটা পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে এক বিদ্যাধর তাকে শিখিয়ে দিল মিস্তিরি কাজ—সে এমন শেখা শিখল যে ভাঙা-চোরা অনেক কিছুই সে জোড়া দিয়ে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

এইবার সেই চারভাই চমচম চারদিক থেকে হনহন করে হরদম চলতে লাগল তাদের সেই একত্র হওয়ার জায়গায়! কিছুদিন পরে তারা একত্র হল সেই জায়গায়। যে যা শিখেছে, তা অন্য ভাইদের বলল! তারপর তারা চলল তাদের বাড়ির দিকে।

তারা তালে তালে বাজাতে লাগল মাদল। গাইতে লাগল গান। ওঃ, সেই গানের কি তাল! যেন ফাটিয়ে দিতে লাগল আসমান!

চারভাই চমচম চলে আর চলে। তারা এসে পোঁছে গেল এক মস্ত বড় রাজার দেশে। সেই রাজার নাম টংটংকার-ঝংঝংকার। তখন তারা শুনল,—লম্বা লম্বা দাঁতওয়ালা, হাতওয়ালা, বাঁকা বাঁকা ঠ্যাংওয়ালা আর কপালে একটা চোখওয়ালা এক দানব সেই রাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। রাজার মেয়ে বেঁচে আছে, কি নেই, কোথায় আছে,—তার কিছুই ঠিক নেই। অনেক খোঁজ করেও নেই দানবের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই রাজবাহাদুর ঘোষণা করেছেন,—যে বীরপুরুষ সেই রাজকন্যাকে এনে দিতে পারবে, সে হবে সেই রাজার জামাই।

চারভাই চমচম তখনই রাজার কাছে গেল। বলল,—"মহারাজ, আমরা সেই দানবের দাঁত ভাঙব, হাত ভাঙব, ঠ্যাং ভাঙব, তাকে ব্যাং বানাব! আপনার মেয়েকে খুঁজে আনবই আনব!"

রাজা বলে উঠলেন, পুরুষ পৌরুষবলে
মান পায় মহীতলে
যাও তোমরা ভীমের মত
দানবকে কর পদানত !

চারভাই চলে গেল ! তারপর দ্বিতীয় ভাই সঙচমচম তার আয়নার দিকে চেয়ে দেখল, সেই রাজকন্যা সেই দানবের কাছে রয়েছে এক মহাসাগরের পরপারে। ছোট ভাই টংচমচম তখনই নানারকম ফুল দিয়ে তৈরী করে ফেলল একখানি নৌকা। সেই ফুলনৌকায় চারজনে চড়ে চলল মহাসাগরের পরপারে। তাদের ভয় দেখাতে লাগল মহাসাগরের লাখ লাখ ঢেউ। কিন্তু চারভাই মনে করল, ওসব তো যেন ফেউ—ফেউ, ঘেউ—ঘেউ ! ওসব কি গ্রাহ্য করে কেউ। তারপর উঠল ঝড়। আকাশে বাজ হাঁক দিল ভয়ংকর। করাল বিজলী হাসতে লাগল বিকট হাসি।

আর হল কি—আকাশ থেকে তাল-বেতাল ঐ চার ভাইদের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে লাগল মস্ত বড় বড় লোহার তাল। কিন্তু একটা তালও চারভাইদের মাথায় লাগল না। সবই পড়ল জলে। তখনই জলে আগুন।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, কিন্তু চারভাই চমচমের ফুলের নৌকা চলে গেল তারই ভিতর দিয়ে। যারা সৎ তারা সবরকম বিপদের মধ্যেও খুঁজে পায় পথ !
চারভাই চমচম মহাসাগরের পরপারে পোঁছে গেল। দানব তখনই ঘোর গর্জন করে ওদের চারভাইসহ নৌকোটা ধরে আকাশে তুলে মারল একটা আছাড়। নৌকা হয়ে গেল চুরমার কিন্তু চারভাই চমচমের কিছুই আঘাত লাগল না। তৃতীয় ভাই ঢঙচমচম তখনই দানবের উপর মারল বাণ। দানবের দেহটা হয়ে গেল খানখান। রক্তের ছুটল বান। রাজকন্যা তখন যে কত খুশী, তার মুখে তখন হাসি আর হাসি।

সেই আনন্দের সময়ে, চারভাই চমচমের প্রথমজনের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরুতে লাগল একটি গল্প। লোকে খেঁকশিয়ালকে বলে শিয়াল পণ্ডিত। কিন্তু ছাগল-পাঁঠাকে বলে বোকা ছাগল, বোকা পাঁঠা। এই জন্য এক ছাগলের মনে বড়ই দুঃখ।

সে একদিন ভাবল,—কি করে আমি আমার এই দুর্নামটাকে দূর করতে পারি ?
ছাগল অনেকদিন ধরে ভাবতে লাগল। কিন্তু দুর্নামটা দূর করার একটা উপায় কিছুতেই ভেবে পেল না।
একদিন সেই ছাগল একটা জঙ্গলের মধ্যে ঘাস খাচ্ছে, আর মনে মনে ছাগল-পণ্ডিত হওয়ার কথা ভাবছে।

ঐ সময়ে সে হঠাৎ দেখতে পেল, একটা বাঘ অনেক দূর থেকে ওর দিকেই তেড়ে আসছে। বাঘকে তেড়ে আসতে দেখে, ছাগল তখনই দিল সেখান থেকে দৌড়।

সে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। তখন কতকগুলো লোক তাকে দেখতে পেল। তারা বলে উঠল,—"ওরে ছাগল, অত ছুটছিস কেন?"

ছাগল তখন আসল কথাটি বলল না। সে বলে উঠল, "বাঘের সঙ্গে আমার দৌড়ের পাল্লা হচ্ছে। দৌড়ে বাঘ জেতে, কি আমি জিতি, তাই দেখতে হবে। ঐ দেখছ না, আমি ঐ বাঘের চেয়ে কতখানি বেশি দৌড়িয়ে এসেছি! ঐ বাঘ তো আমার অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে।" ছাগলের ঐ কথা শুনে, পশুরা চেয়ে দেখল, সত্যি একটা বাঘ ছুটে আসছে, কিন্তু সে সেই ছাগলের চেয়ে পিছনে পড়ে রয়েছে—ছাগল অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

ঐ কাণ্ডটা দেখে, সেইসব পশুরা ভাবল, এই ছাগল যা বলেছে, তা মিথ্যে নয়। বাঘ আর ছাগলের মধ্যে দৌড়ের পাল্লাই হচ্ছে আর ঐ বাঘ এই ছাগলের কাছে দৌড়ে হেরেই যাচ্ছে।

একটি গুণধর গণ্ডার তখন বলে উঠল, "ঐ যে বাঘ, ওটা কি আর সত্যি বাঘ? ওটা একটা ছাগ, ওটা যদি একটা বাঘই হত, তাহলে, এই ছাগলের কাছে কি দৌড়ে হেরে যেত? তা যেত না। কিন্তু গুণধর গণ্ডারকে অনেক পশু বলত একটা গুণ্ডা! তাই গণ্ডারের কথায় কোন কান দিল না।

তারা স্ফূর্তিভরে বলে উঠল, 'জয়, ছাগলের জয়! জয়, ছাগলের জয়!'

সেই বাঘ তখনও ছুটে আসছিল। কিন্তু ঐ "জয় ছাগলের জয়!" কথাটা শোনা মাত্রই, সে ভাবল, ওরা অতগুলো পশু যখন একসঙ্গে ঐ ছাগলের জয়ধ্বনি করছে—তখন নিশ্চয়ই ওরা সবাই ঐ ছাগলের প্রজা! ওরা নিশ্চয়ই ছাগলের পক্ষ হয়ে আমার সঙ্গে লড়বে! সেইজন্য ছাগলের জয়ধ্বনি করছে! সুতরাং আমার এখন কি করা দরকার? লেজ গুটিয়ে পালানো দরকার!

ঐ সব ভেবেই বাঘবাবু তখন তার লেজটি গুটাল। যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে ফিরে দিল দৌড়! ছাগল অতগুলো পশুর মধ্যে থেকেও, তখনও বাঘের ভয়ে কাঁপছিল।

সে যখন, দেখল বাঘ অন্য দিকে চলে যাচ্ছে, তখন সে অসাবধানে বলে উঠল, "যাক, বাঁচা গেল!"

ছাগলের মুখ থেকে ঐ "বাঁচা গেল" কথাটা শোনা মাত্রই, কয়েকটি চারপেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বাঁচা গেল। একথা বলছিস কেন রে? তাহলে কি বাঘ তোকে ধরে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছিল? তুই যে বলছিলি, বাঘ আর তোর মধ্যে দৌড়ের পাল্লা হচ্ছে, সে কথা কি তা হলে সত্যি নয়?"

ছাগল তখন একটু ছাগল-নাচ দেখাতে দেখাতে বলল, "ছাগলের কথা কি সব সময়ে সত্যি হয়? ছাগলের কথা যদি সব সময়ে সত্যিই হত, তাহলে ছাগলকে কি আর লোকে ছাগল বলত? তা হলে ছাগলকে সকলে বলত সত্যবাদী বাবাজী! তাই না? তাই না?

সব পশু বলে উঠল, "আহাহা! আহাহা! কে বলে তোকে ছাগল? তুই তো পাগলের বাবা।" ঐ মজার গল্পটা সকলের মনের মধ্যে একেবারে এঁটে গেল।

ঐ গুলজার করা গল্পের পর, চারভাই চমচমের দ্বিতীয় ভাইও আর দেরী করতে পারল না। সে শুরু করে দিল ঃ ময়ূর নগরের রাজা ছিলেন টঙ্কালালডঙ্কালাল।

তিনি রোজ ভোরে আকাশে বেড়াতে যান। সেখানে নাকি তিনি কিছু আঙুর পান। সেই আঙুর তিনি খান! এক রকম লতা আছে, তাই দিয়ে তৈরী গুড় খেয়েও তিনি খুবই খুশী হন।

তিনি তাঁর প্রজাদের খুবই ভালবাসেন। আর নানারকম গল্প শুনতেও অল্প ভালবাসেন না। একটু বেশিই ভালবাসেন।

যারা তাঁর কাছে রোজ নানারকম গল্প বলে, তিনি তাদের সবাইকে একটি করে টাকার থলে দান করেন। আর তাদের গলায় পরিয়ে দেন ফুলের মালা।

একদিন এক গল্পফেরিওয়ালা সেই রাজার কাছে এল। গল্প ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই সে সেই রাজার কাছে খুবই সমাদর পেল।

রাজা টঙ্কালালডঙ্কালাল হেসে বললেন, "ওহে গল্পফেরীওয়ালামশাই, ভূতের গল্প আমরা অনেক শুনেছি। ভূতের গল্প আর চাই না!"

"তা হলে কি গল্প বলব, মহারাজ?"—বলে উঠল সেই গল্পফেরীওয়ালা।

রাজা বললেন,—"ভূতের গল্প আর চাই না এখন চাই অদ্ভূত গল্প।"

তখন তখনই সেই গল্পফেরীওয়ালা তার গল্প আরম্ভ করে দিল।

মহারাজ, দানবডাঙার কাছে একটি দেশ আছে! সেই দেশের নাম অদ্ভুত। সেই অদ্ভূতের এক ভূতভদ্রলোক একটি গল্প বলেছিল।

সেই অদ্ভুত দেশে একসময়ে ছিল এক ভূত আর এক ভূতী—অর্থাৎ, পেত্নী।

সেই যে ভূত, একদিন সে যমের জামাই হওয়ার জন্য যমের বাড়ি চলে গেল। তখন সেই অদ্ভুত দেশে সেই ভূতী রইল তার একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে।

তারপর, অনেকদিন চলে যাওয়ার পর সেই ভূত আর ভূতীর সেই ছেলেটি বেশ বড় হয়ে উঠল। ভূত আর ভূতীর সেই যে ছেলেটি, সেটি কি?

সেটি কি আর? একটি শয়তান।

সেই শয়তান একদিন তার মা সেই ভূতীকে বলল, "মা, আমি বিদেশে বাণিজ্য করতে যাব।' ভূতী বলল, সে তো, বেশ ভালো কথা। যাও বাণিজ্য করতে। কিন্তু পাঁচ রকম প্যাঁচ করে পয়সা রোজগার করবার পিপাসা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। ভেজালের জাল দিয়ে ভেল্কিবাজি তুমি যেন কোরো না।" সেই সুবোধ শয়তান বলে উঠল, "না মা, তা করব না!" শয়তান বিদেশে চলে গেল। সেখানে বাণিজ্য চালাতে লাগল।

সেখানে সে দেখল, "যে টাকা অচল, তাকে ফাঁকি মন্তরের চোটে বেশ সচল করা হয়। তখন সেই টাকা বেশ হেঁটে চলে, ঘুরে বেড়ায়"

সেই ভূতী তার সেই শয়তান ছেলের কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পায়। সেই চিঠিকে সে যেন মনে করে চিনি।

একবার সেই শয়তান তার মা ভূতীর কাছে এক চিঠিতে লিখল, "মা, এই সব দেশে মধু পাওয়া যায় না। তুমি আমার জন্য একটু মধু যোগাড় করো। আমি যখন বাড়ি যাব, তখন তা খাব।" শয়তানের পত্তর পেয়ে ভূতীর তখন কত ফুর্তি।

ভূতী সেইদিনই কতকটা মধু যোগাড় করে ফেলল। যত্ন করে রেখে দিল।

ভূতীর বাড়ির কাছে ছিল এক ডাইনীর বাড়ি। সেই ডাইনীর ছিল একটি মেয়ে।

একদিন সেই মেয়েটি ছুটতে ছুটতে সেই ভূতীর কাছে এল।

ভূতী বলে উঠল, "কি রে ডাইনীর ঝি, অত ছুটতে ছুটতে এসেছিস কেন?"

ডাইনীর ঝি বলে উঠল, "ভূতী মাসি, ভূতী মাসি, আমাদের বাড়ির শ্মশানে আজ প্রেতঠাকুরের পূজো হবে। পূজোয় যে মধু চাই। কিন্তু মধু আমরা কিছুতেই যোগাড় করতে পারি নি। তোমাদের মধু আছে? আমাদের একটু দেবে?"

ভূতী সেই প্রেতঠাকুরের নাম শুনে তাকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম করল।

সে বলল, "ওরে ডাইনী দিদির মেয়ে, মধু তো আমার ঘরে নেই। থাকলে নিশ্চই দিতুম প্রেতঠাকুরের পূজোর জন্য কি একটু মধু দিতুম না? নিশ্চয় দিতুম। নেই, নেই, মধু নেই।" ডাইনির মেয়েটি ছুটে এসেছিল। আবার ছুটেই চলে গেল।

ভূতীর ঘরে কিন্তু মধু ছিল। কি সে বলল, নেই।

তখনই কয়েকটা ধড়িবাজ ভূত আর শয়তান সেই ভূতীর সামনে এসে নাচতে আরম্ভ করল ধেই ধেই।

তাদের সেই নাচের চোটে চারধারে আগুন জ্বলে উঠল, কয়েক কুড়ি সাপ ফোঁস ফোঁস করে উঠল, আর চারধার থেকে হাজার হাজার ঢিল এসে পড়তে লাগল সেই ভূতীর গায়ে আর মাথায়। ভূতী তখন সেই উৎপাতের চোটে করতে লাগল হায় হায়!

সে তখনই তার মধুর হাঁড়ি থেকে কতকটা মধু তুলে নিয়ে, সেই মধু তার কাপড়ের

আঁচলে বেঁধে নিয়ে, চলে গেল সেই ডাইনীর আস্তানায়।

প্রেতঠাকুরের পূজোর জন্য মধু দিয়ে দিল।

সেইদিন রাত্রে ভূতী যখন তার ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন সেই প্রেতঠাকুর ভূতীর মাথার কাছে এসে গেল। প্রেতঠাকুর সেই ভূতীর লম্বা চুল ধরে একটা টান মারল।

ভূতীর চোখ ছেড়ে ঘুম ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল।

প্রেতঠাকুর তার চোখ লাল করে, গাল তালের মত করে, বলে উঠল, "ওরে ভূতী মানুষে আমাদের কেন ভয় করে, কেন ঘৃনা করে তা জানিস? যা মিছে তা হচ্ছে যেন বিছে! সেই মিছেরূপে বিছেকে আমরা অর্থাৎ ভূত-প্রেত-প্রেতী-দৈত্য-দানব-রাক্ষস-রাক্ষসীরা আদর করি, পুষি, ভালবাসি। তাই আমরা হয়েছি শ্মশানের বাসিন্দা। তাই মানুষে আমাদের চায় না।"

ভূতী একটা ভেংচি কেটে বলে উঠল, "আমি তোমার উপদেশ ভুলব না।"

প্রেতঠাকুর তখন তার পা উপর দিকে তুলে, হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

সেই অদ্ভুতের ভূতভদ্রলোক আরো একটা গল্প বলেছিল। সেইটি আরও চমৎকার। ভূতের রাজার ছেলেমেয়ে ছিল না। সেইজন্য তার মনে ছিল খুব দুঃখ।

ভূতরাজা একটি ছেলে লাভ করবার জন্য অনেক দিন ধরে ভূতনাথের তপস্যা করল। ভূতনাথ ভূতরাজার উপর খুবই খুশী হলেন। তাকে একটা ঘুষি মেরে বললেন, "তুমি একটি ছেলে পাবে।"

ওর পরে ভূতরাজার একটি ছেলে হল। ছেলেটি এত সুন্দর হল যে ভূতরাজ্যের সব ভূতের মধ্যে সে হল এক অদ্ভুতভূত!

ভূতরাজার ছেলে সেই অদ্ভুতভূত কয়েক বছরের মধ্যেই মস্ত বড় এক দানবের মত হয়ে উঠল। সে ঘোড়ায় চড়ে, সিংহে চড়ে, মস্ত হাতিকে হাতে তুলে নাচায়, মোষের লেজ ধরে ঘোরায়!

সেই অদ্ভুতভূতের খেলার সাথী হল কয়েক গণ্ডা দানব ছেলে, আর কয়েক কুড়ি দৈত্য ছোকরা। তারা লাফ দিয়ে আকাশে ওঠে, ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে, আগুনকে খুন করে আর বজ্রকে ধরে ভেজে খায়!

একদিন সেই ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূত নদীর তীরে বেড়াচ্ছে। তার সাথে রয়েছে তাদের একটি চাকর। তার নাম দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌। তার বয়েস অল্প নয়, বেশি নয় পনের-ষোল বছর হয় হয়।

তখন সেই নদীর স্রোতে একটি লালরঙের পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছিল। ফুলটি দুলছিল, যেন নাচছিল। ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূত তাদের চাকর দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌কে হুকুম করল,—"ওরে,

ওরে অকেজো ছেলেটা, নদীর মধ্য থেকে তুলে আন ঐ ফুলটা! তুলে আন! নদীতে লাফিয়ে পড়! ফুলটা ধর! ফুলটা এনে আমাকে খুশী কর!"

ভূতের চাকর দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে নদীর মধ্যে পড়ল। লাল পদ্মটাকে ধরল। আর ঠিক তখনই একটা হাঙ্গর কামড়িয়ে ধরল দুড়ুম্‌দুড়ুমের ঠ্যাং।

দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ আর্তনাদ করতে লাগল। হাঙ্গরের সঙ্গে লড়তে লাগল।

কিন্তু হাঙ্গর কি তখন তাকে ছাড়ে! জলের মধ্যে চলতে লাগল ভূত আর হাঙ্গরের লড়াই। ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূত চঞ্চল হয়ে পড়ল, অস্থির, হয়ে পড়ল।

সে ঘোর শব্দ করে তাদের ভূতচাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "ওরে, কে তোকে কি করছে রে?"

দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ আর্তনাদ করার স্বরে বলে উঠল "একটা হাঙ্গর আমাকে হয়রান করছে। ও আমাকে যমের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে চাই না।"

ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূত অমনি একটা ঘোর গর্জন করে উঠল।

"কী, আমাদের বাড়ির লোককে হাঙ্গরে যমের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়? হাঙ্গরের এতবড় আস্পর্ধা!"

ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই, ভূতরাজার পুত অদ্ভুতভূত একটা হনুমানী লাফ দিয়ে পড়ল সেই নদীর মধ্যে। তার সেই পতনের চোটে নদীর প্রায় অর্ধেকটা জল ভয় পেয়ে দৌড় দিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল।

ভূতরাজার পুত অদ্ভুতভূত সেই হাঙ্গরকে জাপটে ধরল। হাঙ্গরও সেই অদ্ভুতভূতকে কামড়িয়ে ধরল। আরম্ভ হল দুই মরদের লড়াই, আর বড়াই!

ছোকরা দুড়ুম্‌দুড়ুমের শরীরটা তখন হাঙ্গরের দাঁতের অত্যাচারে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে।

দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ কোনরকমে সাঁতার কেটে নদীর কূলে পৌঁছে গেল। জল থেকে উঠে পড়ল। অদ্ভুতভূত আর হাঙ্গরের লড়াই তখন পুরোদমে চলছে।

কিন্তু সেই হাঙ্গর এমন হাঙ্গর যে, অদ্ভুতভূত সেটাকে কিছুতেই জব্দ করতে পারছে না। লড়াই চলল অনেকক্ষণ ধরে। সেই লড়াইয়ের চোটে নদীর জল তখন নদী ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে!

দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সেই লড়াই দেখছিল।

ভূতরাজার পুত অদ্ভুতভূত হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, "ওরে দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌, আমি আর পারছি না! পারছি না! আমার বাবাকে বলিস, মাকে বলিস, তাঁরা যেন আমার জন্য দুঃখ না করেন!"

ভূতরাজার চাকর দুড়ুম্‌দুড়ুম্‌ তখনই সেখান থেকে দৌড় দিল। ভূতরাজার কাছে চলে

গেল। ভূতরানী আর ভূতরাজা শুনল, তাদের ছেলেকে হাঙ্গরে গিলেছে।

ভূতরাজা আর ভূতরানী তখনই অনেক সৈন্যসামন্ত ও লোকজন নিয়ে চলে গেল সেই নদীর তীরে।

নদীর জল তোলপাড় করা হল। কিন্তু ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূতকে আর পাওয়া গেল না ; সেই হাঙ্গরকেও ধরা গেল না।

ভূতরাজা ও ভূতরানী তাদের ছেলে-হারা হয়ে শোকে-দুঃখে হাহাকার করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে সেই ভীষণ হাঙ্গর সেই নদীর ভিতর থেকে তাদের সামনে দেখা দিল ! আর তার প্রকাণ্ড মুখটা একবার হাঁ করল। তৎক্ষণাৎ সেই হাঙ্গরের হাঁয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ভূতরাজার ছেলে অদ্ভুতভূত।

হাঙ্গর বলে উঠল, "ওহে ভূতরাজা ভূতরানী, তোমাদের ছেলে এই অদ্ভুতভূত তোমাদের কাজের লোক দুড়ুম্‌দুড়ুমকে বাঁচাবার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ! অদ্ভুতভূত তার ঐ ভাল কাজটার জন্যই তার জীবনটা এখন ফিরে পেল।"

ছোট ভাই টংচম্‌চম্‌ তখনই ফুল-নৌকার ভাঙা অংশগুলো দিয়ে আবার তৈরী করল ফুল-নৌকা। চারভাই চম্‌চম্‌ তখন রাজকন্যাকে ফুল-নৌকায় নিয়ে সাগর পার হল তারা রাজা টংটংকারঝংঝংকারের কাছে এল। রাজা তাঁর হারানো মেয়েকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, "তোমরা চারভাই আমার কন্যাকে দানবের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমাদের মধ্যে কার কাছে আমার এই মেয়েকে বিয়ে দেব, তাই এখন বল।"

চার ভাই চম্‌চম্‌ বলে উঠল, "মহারাজ, আপনার এই কন্যাকে আমরা মনে করি আমাদের বোন। আপনি অন্য কারুর সঙ্গে এর বিয়ে দিন।"

ঐ কথা শুনে, চারভাই চম্‌চম্‌দের মহত্ত্ব দেখে, রাজা টংটংকারঝংঝংকার বলে উঠলেন, "চমৎকার ! চমৎকার ! তোমাদের মহত্ত্বের তুলনা নেই আর !" তখনই সেই রাজা সেই চারভাইকে দিয়ে দিলেন অনেক মণিরত্ন অনেক সোনা-দানা !

তারপর লাল-নীল নগরের রাজার ছেলের সাথে সেই রাজার মেয়ের হল বিয়ে।

চারভাই চম্‌চম্‌ হল সেই মেয়ের গুণের ভাই !

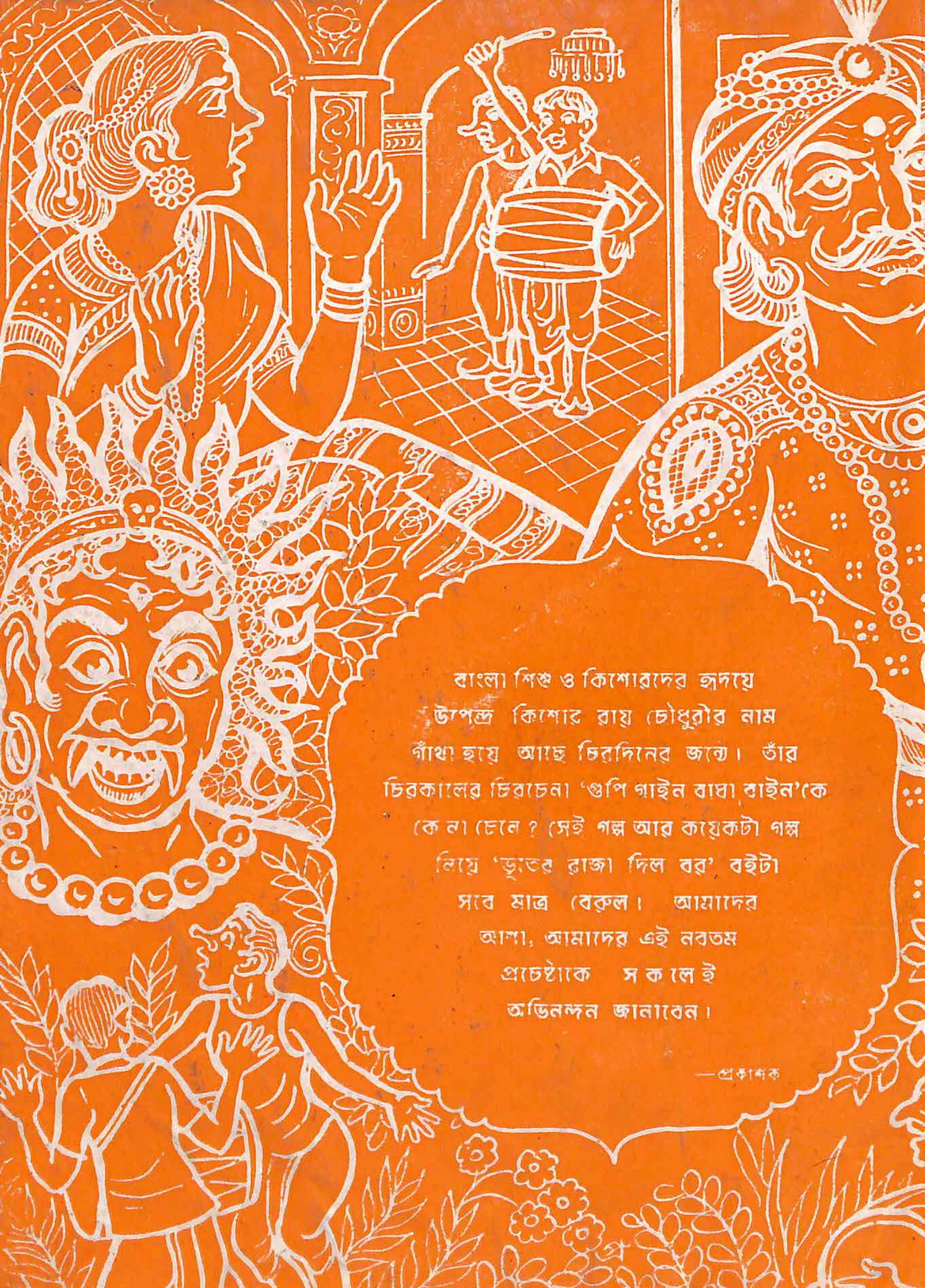
সেই বিয়ের উৎসবের পরে চারভাই চম্‌চম্‌ চলে গেল তাদের বাবার কাছে ! পিতার আশীর্বাদ, পূর্ণ করল তাদের মনের সাধ।

তখন থেকে তাদের লোক বলতে লাগল, চার চতুর চম্‌চম্‌ !

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের মনের মত বই

পুস্তকের নাম	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	লেখকের নাম
গুপি আর বাঘা	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	রাজা আর টুনটুনি	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
টুনটুনি রাজার কথা	ঐ	ভূতের রাজা দিল বর	ঐ
জাপানী দেবতা	ঐ	চীনে পটকা	সুকুমার রায়
পুতুলের আবোল তাবোল	সুজিত নাগ	পরীর দেশে দৈত্যরাজ	সুজিত নাগ
ঠাকুরমার ঝুলি	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঠাকুরদাদার ঝুলি	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
আলাউদ্দিন আশ্চর্য্য প্রদীপ	ঐ	আলিবাবা ও চল্লিশ চোর	ঐ
গল্প দাদুর আসর	ঐ	যাদুকর ও ডাইনী	ঐ
ঠান দিদির থলে	ঐ	চাঁদু খুড়োর অভিযান	অধীর দাস
কুঁজো বুড়ীর গল্প	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ছোটদের পারস্য উপন্যাস	নান্টু গাঙ্গুলী
ছোটদের আরব্য উপন্যাস	ভূপেন ভট্টাচার্য্য	নীল পাথরের রাজকন্যা	নবকুমার ভট্টাচার্য্য
সিংহ রাজার শেষ দরবার	সুনীল সরকার	আবোল তাবোল	সুকুমার রায়
পাগলা দাশু	সুকুমার রায়	বহুরূপী	ঐ
বানর রাজপুত্র	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	জীবজন্তুর মেলা	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
এক বোন পারুল	ভূপেন ভট্টাচার্য্য	অচীন দেশের রূপকথা	প্রদীপ চক্রবর্তী
টেন কমাণ্ডমেন্টস্	নান্টু গাঙ্গুলী	অপরূপ কথা	অমরনাথ রায়
বেতাল পঞ্চবিংশতি	বিক্রমাদিত্য	ভিন দেশের রূপকথা	ঐ
বত্রিশ সিংহাসন	ঐ	গোপাল ভাঁড়	হরি নারায়ণ বসাক
চ্যাঙ্গিজ খান	মলয় আচার্য্য	তৈলঙ্গ স্বামী	নবকুমার ভট্টাচার্য্য
লাষ্ট ডেজ অব পম্পাই	ঐ	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	ঐ
রামায়নের গল্প	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ভূতের বাড়ীর রহস্য	প্রভাত মুখোপাধ্যায়
মহাভারতের গল্প	ঐ	ছোট্ট ছেলের যাদুকর	ঐ (যন্ত্রস্থ)



বাংলা শিশু ও কিশোরদের হৃদয়ে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর নাম গাঁথা হয়ে আছে চিরদিনের জন্যে। তাঁর চিরকালের চিরচেনা 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'কে কে না চেনে? সেই গল্প আর কয়েকটা গল্প নিয়ে 'ভূতের রাজা দিল বর' বইটা সবে মাত্র বেরুল। আমাদের আশা, আমাদের এই নবতম প্রচেষ্টাকে সকলেই অভিনন্দন জানাবেন।

—প্রকাশক